হিমবাবু
ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার

পুণ্য দর্শন "মহিমবাবু"র জীবন কথা পেয়ে বড়ই আনন্দিত হলাম। বইখানি এক নিঃশ্বাসে শেষ করেছি এবং বার বৎসরের ঘটনা একদিনে দেখেছি। পুস্তকে বর্ণিত সকল মহাপুরুষ ও তীর্থ মানসপটে দেখে ধন্য হয়েছি। পুণ্য দর্শন শিবতুল্য মহিমবাবুকে বারবার প্রণাম করি।

ডাঃ শ্রীনন্দলাল বসু
( শান্তি নিকেতন )

● ● ●

মহিমবাবুর ত্যাগ, তপস্যা ও পবিত্রতাপূর্ণ জীবনের সংশ্রয়ে আসিলে পাঠক পাঠিকাদের কল্যাণ হবে সন্দেহ নাই।

শ্রীমৎ স্বামী কৃষ্ণানন্দজী
( মানভূম )

# মহিম বাবু

বা

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্গে বার বৎসর

ব্রহ্মচারি-শ্রীপ্রাণেশ কুমার



মূল্য ঃ দুই টাকা

প্রকাশক—
ব্রহ্মচারি-শ্রীপ্রাণেশ কুমার
শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়
৩৯, দেব লেন, ইটালী,
কলিকাতা-১৪

মুদ্রাকর—
শ্রীঅনাদি নাথ কুমার
উমাশঙ্কর প্রেস
১২, গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

## গ্রন্থকারের অপরাপর গ্রন্থ ঃ

১। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা
২। শ্রীশ্রীচণ্ডী
৩। মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ
৪। শঙ্কর আবির্ভাব

—প্রাপ্তিস্থান—

মহেন্দ্র পাবলিশিং হাউস
৩, গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়
৩৯, দেব লেন, ইটালী
কলিকাতা—১৪

## —উৎসর্গ—

গঙ্গাধরের গঙ্গাবারিতে অর্চ্চনার
ন্যায় শ্রীমহেন্দ্রনাথের পুণ্য স্মৃতি-
কথা তাঁহাকেই হৃদয়ের
শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে উৎসর্গ
করা হইল।

—শ্রীপ্রাণেশ কুমার

# নিবেদন

বহুদিনের আশা আজ পূর্ণ হইল, সুস্থ সবল দেহে যাহা সম্ভব হয় নাই, আজ জরা জীর্ণ বৃদ্ধ শরীরে তাহা সম্ভব হইল। বিচিত্র জীবন মালার যে উজ্জ্বল অংশ যাঁহার সঙ্গগুণে সৌরভযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহার মধুর স্মৃতি-কথা যৎসামান্য হইলেও লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইলাম ও তৃপ্তিলাভ করিলাম। এই গ্রন্থে বর্ণিত অতীত জীবনের চিত্রখানি আমার বড়ই সুখদায়ক—পুণ্য কথাগুলি অপরেরও না হইবার কথা নহে।

মহিম বাবু বা শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত ভারত ও বাহিরের বহু লোকের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার জীবন-ব্যাপী এক ধ্যান, জ্ঞান ও সংযম তাঁহাকে দেবোপম করিয়া পূজার্হ করিয়াছে। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন সর্ব্বসমক্ষে সহজ লভ্য ও সদামুক্ত রহিয়াছে এবং জ্ঞানরাশি নানা গ্রন্থে ও বাক্যে নিত্য বিতরিত হইতেছে। ঈদৃশ লোকের বিষয় জানিবার কৌতূহল এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে পূর্ণ হইবে না, হইতে পারেও না; কথঞ্চিৎ হইতে পারিবে। অতএব, এই গ্রন্থ পাঠেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। পাঠকবর্গের আনন্দ, আমারও আনন্দ বৃদ্ধির কারণ হউক।

এই গ্রন্থ লিখিবার কালে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদির অভাবে উদ্ধৃত গীত ও বাক্যাদি যথাযথ মিলাইয়া দিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত আছি। আর, পুরাতন কথা বিস্মৃতি, বিচ্যুতি বা বিভ্রম শূন্য হইতে পারে না, পাঠক মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। বারান্তরে প্রদর্শিত ত্রুটী সংশোধনের ইচ্ছা রহিল। ইতি—

কলিকাতা, নিবেদক,
জন্মাষ্টমী, শ্রীপ্রাণেশকুমার
২৭শে শ্রাবণ, ১৩৫৯ সাল।

# কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের নিকট বিশেষ করিয়া আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি :—

১। শ্রুতলিপিকার—শ্রীমান্ নিরঞ্জন ও তদীয় অনুজ শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন মজুমদার ( M. Sc. )।

২। প্রতিলিপিকার—শ্রীমতী সুজাতা ঘোষ ( B. A. ) ও তদীয়া ভগিনী—শ্রীমতী উমা রায়।

৩। প্রুফ. সংশোধক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত গোপাল কৃষ্ণ ঘোষ।

৪। মুদ্রণ কার্য্যে প্রধান উৎসাহ দাতা ও অর্থ সাহায্যকারী ভাই ব্রহ্মচারী চিন্তাহরণজী।

সৌভাগ্যক্রমে সম্প্রতি মহেন্দ্রনাথের দুই বয়সের দু'খানি ফটো বন্ধুগণের নিকট পাওয়া গেল, তাই এই গ্রন্থে তাঁহার ছবি দেওয়া সম্ভব হইল। একখানি (জীর্ণাবস্থায়) ৬০ বৎসর বয়সের গ্রন্থ লেখা কালীন, আর একখানি ৮৪ বৎসর বয়সের জীর্ণ দেহের। তিনি পূর্ব্বে কখনও ছবি তুলিতে দিতে রাজি হন নাই। ফটো দাতাগণের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

বলাবাহুল্য ইঁহাদিগের কাহারও সাহায্য ভিন্ন এই গ্রন্থ রচনা বা প্রকাশ করা কখনও সম্ভব হইত না। ইহা ব্যতীত আরও অনেকের নিকট নানা ভাবে সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহাদের নিকটও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বিনীত
শ্রীপ্রাণেশকুমার

শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত

বয়স ৮৪ বৎসর
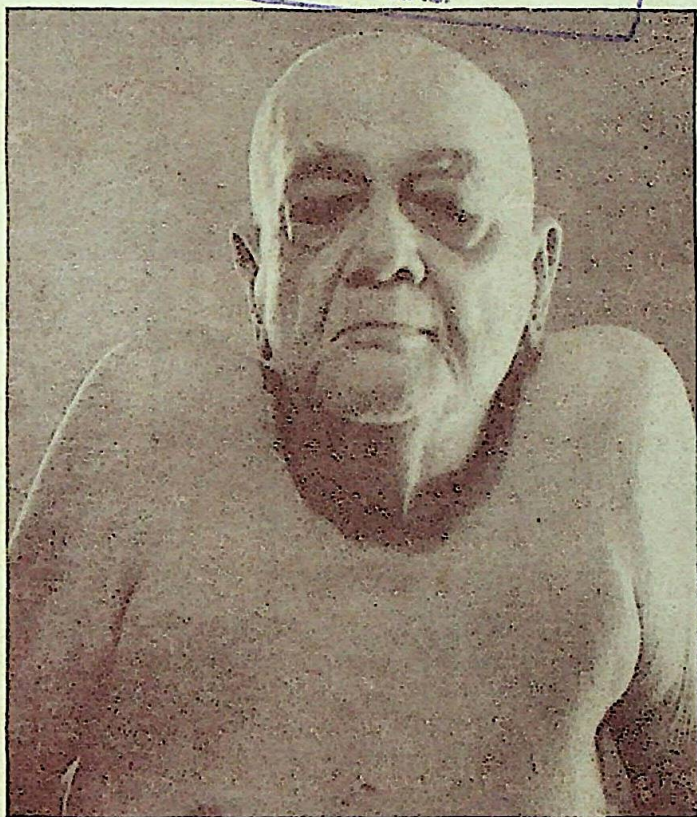
# পরিচয়

মহিম বাবু বা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের

পিতা—৺বিশ্বনাথ দত্ত—এটর্ণি, কলিকাতা।

মাতা—৺ভুবনেশ্বরী দেবী।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ( শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ )

কনিষ্ঠ ভ্রাতা—ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।
A. M. ( Brow. ), Ph. D. ( Munc. )

জন্মস্থান—কলিকাতা, সিমলা, ৩নং গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট।

জন্মসময়—শকাব্দা ১৭৯১ ; বাংলা সন ১২৭৫, ২৯শে শ্রাবণ।
( শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর পরদিবস। )

# সূচীপত্র

# মহিম বাবু

## বা

## শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে বার বৎসর

### প্রথম স্তবক

( কলিকাতায় প্রথম দর্শনাবধি তিন বৎসর )

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ উভয়ে একই রত্নগর্ভসম্ভূত। আকারের ও অন্তরের সাদৃশ্য প্রচুর। জ্যেষ্ঠের ন্যায় বিদ্যার্থীর অদম্য জ্ঞানপিপাসা, অধ্যবসায়, ধৃতি, স্মৃতি ও অন্তর্দৃষ্টি প্রভৃতি মানসিক শক্তি এবং সাধুর গুণ—ত্যাগ, তিতিক্ষা, তেজস্বিতা ও ইন্দ্রিয় সংযম যে কনিষ্ঠে যোগ্যানুরূপ বিদ্যমান, তাহা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সহিত যাঁহারা মিশিয়াছেন তাঁহাদের নিকট সুবিদিত।

একদা এক উৎসবের দিনে বেলুড় মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে স্বামীজির জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নিকট বলিতে শুনিয়াছি, "জান, দিদি! মহিন্* আমার সাদা কাপড়ে সন্ন্যাসীরও বাড়া।" তখন মহেন্দ্রনাথ অনেক সময়ই বেলুড় মঠে মহারাজগণের সহিত বাস করিতেন। আমারও তখন ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহাদের

* শ্রীরাখাল মহারাজ, শ্রীবাবুরাম মহারাজ, মহেন্দ্রনাথের দিদি ও গৌরীমাতা 'মহিন্' বলিতেন। অপর সকলে 'মহিমবাবু' বলিত। 'মহেন্দ্রনাথ' তাঁহার প্রকৃত নাম।

সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে সশ্রদ্ধ প্রণামান্তে আজ মহেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মহেন্দ্রনাথের সহিত এক শুভক্ষণে বিগত চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম পরিচয় হয়। তন্মধ্যে প্রায় দশ বৎসরকাল এক সঙ্গে পান-ভোজনে অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার ভীম-কান্তি ও মননশীলতার গাম্ভীর্য্য এবং মহৎ আদর্শ লাভের প্রেরণায় গতানুগতিকের প্রতি বিদ্রোহ ভাব, যেমন এক দিকে আমাদিগকে দূরে রাখিত, তেমনই অপর দিকে সদ্‌বংশজাত সৌজন্য, উদারতা ও বালকসুলভ সহজ সরল ব্যবহার চিরতরে পরম আত্মীয়ের মত অতি সন্নিকটে আকৃষ্ট করিত। আমাদের প্রতি পদে অশিষ্ট ও অপ্রেমের আচরণ যেভাবে তিনি ভালবাসার মধুর সম্ভাষণ দ্বারা ক্ষমা ও শোধন করিয়া লইয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া আজ এই দেবচরিত্র নরোত্তমকে বারবার অবনত মস্তকে প্রণাম করিতেছি। তাঁহার আশীর্ব্বাদে তদীয় মধুর প্রসঙ্গ যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ হউক ইহাই প্রার্থনা।

ইংরাজী ১৯১১ সালের নভেম্বর মাসের শেষাশেষি পূর্ব্ব জীবনধারা, স্বজন ও স্বভূমি ছাড়িয়া আমি যখন কলিকাতা মহানগরীতে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছিলাম, তখন দৈব-যোগে মহেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হই। প্রথম দর্শনেই তিনি চিরপরিচিতের ন্যায় সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তদবধি বহুদিন এমন ভাবে কাটিয়াছে যে, নিত্য তাঁহাকে একবার দর্শন

না করিলে সে দিন দিনই মনে হইত না। উভয়ের বিস্তর অবসর ছিল। তাঁহারও কোন বিষয়-কর্ম্ম নাই, আমারও প্রায় তদ্রূপই। তৎকালে তিনি নিজ বাড়ীর দেউড়ীর দাওয়াতে পুরাতন গদিযুক্ত লোহার কৌচে বসিয়া নিয়ত গড়গড়াতে তামাক টানিতেন, প্রাতে ও বৈকালে প্রচুর তরল চিনিশূন্য চা পান করিতে দেখিতাম। দু' এক জন ভদ্রলোক প্রায় সকল সময়েই তাঁহার কাছে উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহারাও কেহ কেহ চা ও ধূমপান করিতেন। অনেকগুলি হুক্কায় জল ভরা থাকিত, এবং দশ বারোটি কলিকাতে সর্ব্বক্ষণই তামাক সাজান থাকিত। কাশী, গয়া, বিষ্ণুপুর ও বালাখানা প্রভৃতি নানা স্থানের উৎকৃষ্ট তামাকের সংগ্রহ ছিল। সর্ব্বক্ষণই স্থানটি তামাকের সুগন্ধে ভরপূর থাকিত। আমরা রাজঠাটে ফকিরকে দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিতাম না লোকটী কিরূপ।

এই সময় মহেন্দ্রনাথের নিকটে নিত্যই যাঁহাদের আসিতে দেখিতাম তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পরপারে চলিয়া গিয়াছেন; অল্পই জীবিত আছেন। ৺কালীপদ মুখার্জ্জী, ৺কটীমামা, ৺চিরঞ্জীব বলিয়ার, ৺পারিজাত গুপ্ত, ৺জ্ঞান সেন, ৺হেম নাগ, ৺অহিণ ঘোষ প্রভৃতি আর ইহ জগতে নাই। শ্রীসুরেন্দ্র সেন, ডাঃ পশুপতি বসু, ডাঃ ঘোষাল, শ্রীহরেন্দ্র নাগ, শিল্পাচার্য্য ডাঃ শ্রীনন্দ লাল বসু ও শিল্পাচার্য্য শ্রীশৈলেন দে প্রভৃতি জীবিত আছেন। পরে শ্রীনরেন্দ্র সেন, শ্রীআশুতোষ গাঙ্গুলী, শ্রীমহাদেব শর্ম্মা, শ্রীবসন্ত চট্টোপাধ্যায়, ৺রাজারাও, ডাঃ যামিনী ঘোষ প্রভৃতি

অনেকে আসিয়া যোগদান করেন। শ্রীসুপ্রকাশ সরকার তাঁহার নিকট আত্মীয় এবং পূর্ব্ব হইতেই অন্য ভাবে আসিতেন, কিন্তু একক। পরে আমাদের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্টতা জন্মে। আরও অনেকেই আসিতেন তাঁহাদের নাম এখন স্মরণ হইতেছে না। এই সকলের সহিত নানা প্রসঙ্গের কথা উঠিত,—মহাপুরুষদিগের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা হইত; তাঁহাদিগের সাধনা কালে মনের ক্রমোন্নতির বিষয়ে কথা চলিতে চলিতে অনেক সময় কথা বন্ধ হইয়া যাইত এবং একটা সুগভীর ধ্যানের ভাবে সকলে ডুবিয়া যাইতাম। এক একদিন উচ্চ-ভাবের গভীর ধ্যানের ঘোর অনেক ক্ষণ অন্তরে চলিতে থাকিলে মন নীচের দিকে নামাইবার জন্য নিজেই হাস্য কৌতুকের অবতারণা, 'চা'র গান, * তামাকের মন্ত্র † আবৃত্তি এবং গল্পচ্ছলে ঠাট্টা তামাসা করিতেন; এমন কি, মুখভঙ্গী প্রভৃতি কিছুরই ত্রুটী থাকিত না। ইহাতে মনের ভার এবং স্নায়বিক চাপ সঙ্গে সঙ্গে লঘু হইয়া যাইত। পরে মন আবার উচ্চ-স্তরে উঠিতে পারিত। এই ভাবে উপস্থিত সকলের একটা নেশার ঘোরের মত হইত। এক একদিন ধ্যানের আসর এমনই জমিয়া যাইত যে, কাহারও স্নান-আহারের সময় বড়

* তিন আনা রোজ যে পেলি, কি করলি যদি চা না খেলি!
সাহেবেরা দেখলে ভেবে, বাংলা বরবাদে যাবে,
বাঙ্গালীরা—জানানীরা—চা না খেলে।...ইত্যাদি

† তাম্রকূট মহাভাগ, জাতশ্চ নন্দনকাননে।
শত অশ্বমেধ ফলং তস্মিন্ টানে টানে ভবিষ্যতি॥

ঠিক্ থাকিত না। এমনও হইয়াছে যে, এক এক দিন অনেকে অস্নাত অনাহারেই কর্ম্মস্থলে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

নানা দেশের ইতিহাস এবং তথায় নিজ ভ্রমণ কালের ঘটনাবলী; এসিয়া ও ইউরোপের সামাজিক জীবন যাপন পদ্ধতির পার্থক্য; স্বামীজির পাঠ্য ও বাল্যজীবনের কথা এবং তাঁহার সহিত ইংলণ্ডে এক সঙ্গে অবস্থান কালের চিত্র; বরাহনগর মঠের নবীন সন্ন্যাসীগণের প্রথমকার তীব্র বৈরাগ্য ও কঠোর সাধনার কথা; কবি গিরিশচন্দ্রের কাব্য আলোচনা; সাধু শ্রীনাগমহাশয়ের অপূর্ব্ব জীবন-কথা; শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা যেটুকু তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বা স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন তাহার বিষয়; বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সাধনা ও প্রচারের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি এবং পৌরাণিক বহু বিষয়ের অবতারণা হইত। প্রসঙ্গক্রমে নানা দেশের সামাজিক আচার, ব্যবহার ও কৃষি, শিল্প এবং স্থপতি-বিদ্যার বিকাশের কথাও উঠিত। তাহার নিকট কত যে নূতন কথা শুনিতে পাইতাম তাহা তখন আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিত। এই সমুদয় কথাই তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে লিখিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। পাঠক মাত্রেই সে সকলের বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন সন্দেহ নাই। এই সমুদয়ের আলোচনা ও ধ্যান ধারণা দিনের পর দিন চলিতে থাকিত। ঘনিষ্ঠভাবে যাঁহারা মিশিতেন তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি এক নূতন অন্তরের টান জন্মিয়াছিল; নেশাখোরদের নেশার আড্ডার

বন্ধুদের মত রাস্তায় দেখা হইলেই কত যে আহ্লাদ হইত!

জগৎ বিখ্যাত সুন্দরের উপাসক শিল্পাচার্য্য ডাঃ নন্দলাল বসু ও চিত্রকলাবিৎ অধ্যক্ষ শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ দে আর্ট স্কুলে তাঁহাদের ছাত্র জীবনের শেষভাগে মহেন্দ্রনাথের নিকট আসেন এবং শিল্পবিদ্যার বিশেষত্বের নূতন প্রেরণা লাভ করেন।

মাঝে মাঝে তখন পুষ্টিকর ভোজেরও ব্যবস্থা হইত। নিজেরাই মাংস আনিয়া সন্ধ্যারাত্রিতে বাহিরের ঘরে ষ্টোভে রান্না করিয়া পাঁউরুটী সংযোগে আহার করিতাম। ষ্টু, সূপ মাটন-রোষ্ট প্রায়ই শীতের সময় হইত। দুগ্ধ বা মিষ্টান্ন বড় বিশেষ চলিত না। বেল, আনারস, আম ও কমলালেবু বেশ চলিত। খুব স্বচ্ছলতা তখন না থাকিলেও এই প্রীতিভোজ সকলেরই তৃপ্তিদায়ক হইত। কোন কোন ভক্ত পরিবার হইতে সুস্বাদু নোন্‌তা খাবারও আসিত; তাহা আমরা কত আনন্দ করিয়া খাইতাম! এইভাবে মহানগরীর বক্ষে এক আনন্দ-মেলার পত্তন হয়।

শ্রীশ্রীগৌরীমাতার। সহিত আমরা এই সময় পরিচিত হই। তিনি মহেন্দ্রনাথকে বড় স্নেহ করিতেন; আমাদিগকেও সন্তানবৎ দেখিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমে"র তখন প্রথমাবস্থা। সর্ব্বদাই তিনি কর্ম্মব্যস্ত থাকিতেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহাকে কলিকাতার বাহিরেও যাইতে হইত। এখানে থাকাকালীন প্রায়ই মহেন্দ্রনাথকে একবার দর্শন দিয়া

যাইতেন। কখনও তিনি শুধু হাতে বড় আসিতেন না; যৎসামান্য হইলেও খিচুড়ী, মালপোয়া প্রসাদ, আম বা অন্য কিছু খাবার হাতে লইয়া আসিতেন এবং তাঁহাকে ও আমাদিগকে খাওয়াইয়া যাইতেন। মাতাজীর অযাচিত অপার্থিব স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণ ও ব্যবহার আজিও স্মরণমাত্র আমাদের হৃদয় পুলকিত হয়। তিনি নিজে কত শুদ্ধাচারিণী ছিলেন, আমরা তাহার বিপরীত!—আমাদিগকে কখনও অস্পৃশ্য জ্ঞান করিতেন না; বিছানায় বসিয়া খাওয়াইতেন ও মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন।

মহেন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে পুরীর বিমলদের সহিত বদরীনারায়ণ গমন করেন। তথা হইতে আসিয়া অল্পদিন পরেই, বর্ষাকালে স্টীমারযোগে তমলুকে বর্গভীমাদেবী দর্শন করিতে যান। মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে ৺পারিজাত গুপ্ত, ৺জ্ঞান সেন, শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীশৈলেন দে এবং আরও দুই তিন জন ও আমি ছিলাম। রূপনারায়ণ-নদীর বিশাল আয়তন তখন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নদীর জল মন্দিরের সন্নিকটে জোয়ারের সময় আসিত মনে পড়ে। আমাদের তথায় তিন দিনের বেশী থাকা হয় নাই। রূপ-নারায়ণের তীরে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত ও বিখ্যাত ভীমাদেবীর মন্দির দর্শন ও নিত্য মায়ের শোল মাছের প্রসাদ গ্রহণ সকলেরই বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

এই সময় মহেন্দ্রনাথকে প্রায়ই শৈবভাবের কথা বলিতে

শুনিতাম। সময় সময় আপন ভাবের আবেগে গান গাহিতেন ও স্তোত্র-মন্ত্রের দুই এক অংশ আবৃত্তি করিতেন।

১। "নাচে বাহু তুলে, ভোলা ভাবে ভুলে,
বব বম্ বব বম্ বাজে গালে॥"
২। "শশধর তিলক ভালে গঙ্গা জটাজালে,
করে লয়ে ত্রিশূল রুদ্র বিরাজে··· ॥" ইত্যাদি

তাঁহার প্রিয় গান ছিল; সুর তাঁহার নিজস্ব মন্দ্রগম্ভীর, এখনও কর্ণে যেন লাগিয়া আছে! প্রাতে ও বৈকালে চা পানের সময় ঐরূপ গান দিনের পর দিন গাহিতেন। নৌকা বা স্টীমারযোগে বেলুড় মঠে যাইবার পথে নিমতলা ঘাটের দত্তদের স্থাপিত বৃহদাকার বুড়াশিব আমরা দর্শন ও পূজা করিয়া যাইতাম। মন্দির হইতে বাহির হইবার কালে তাঁহার মুখ দীপ্ত ও গম্ভীর হইয়া উঠিত; কথা বড় কহিতে পারিতেন না। আপন ভাব চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন। ভাবে তিনি চিরদিনই একক। কীর্ত্তনের ঝঙ্কারে বা নৃত্যে তাঁহাকে কোন দিনই আকৃষ্ট হইতে দেখি নাই।

তাঁহার অন্তরের যথার্থ পরিচয় পাইবার পক্ষে একটী কথা এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। কেননা, মহেন্দ্রনাথ চিরদিনই আপন ব্যক্তিগত বিষয়ে এত চাপা যে, তাঁহার নিজ জীবনের অতীত ঘটনার বিষয় খুব কমই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে একাধিকবার বলিতে

শুনিয়াছি যে, "মহিন আমার চিরদিনই বোকা! হাট, বাজার করতে বা পয়সা কড়ির হিসাব করতে জানে না। চিরকালই মহিন বই কেতাব নিয়ে পড়ে থাক্‌তো। সদাই উদার উদাসীন! দুঃখ কষ্ট সইতে তাঁর মত কেউ নেই। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পুরুষও এমনটী বড় দেখতে পাবে না;"...ইত্যাদি। ইহাই মহেন্দ্রনাথের সঠিক চিত্র ও জীবনের সুর;—ব্যবহারিক জগতে শিশু, জ্ঞানে ও ইন্দ্রিয়সংযমে ঋষি! এত ত তামাক খাইতেন, কিন্তু মাতৃজাতির সম্মুখে কখনও তামাক বা চুরুট টানিতেন না। তাঁহাদের কেহ কখনও তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে পারিতেন না; কিংবা তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কখনও মহেন্দ্রনাথকে কথা বলিতে দেখি নাই।

মহেন্দ্রনাথের নিকট শুনিয়াছি, তিনি পাঠ্যাবস্থায় প্রতি রবিবার সন্ধ্যাবেলায় ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনা কালে উপস্থিত হইতেন। মাঘোৎসবের সময় কয়দিনই উৎসবে যোগদান করিতেন। কেশব বাবু তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বন্যায় দেশময় এক ধর্ম্মের প্লাবন আনিয়াছিলেন। ধর্ম্মপিপাসুগণ দূরে থাকিতে পারিতেন না। কেশব বাবুর বক্তৃতা হইলেই মহেন্দ্রনাথ শুনিতে যাইতেন। কেশব বাবু ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের কথা তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিতেন। উপাসনাকালে তাঁহাদের মুখে যে জ্যোতিচ্ছটা বাহির হইত তাহার বিষয় বলিতেন যে, এরূপ সচরাচর দেখা যায় না। আর আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেন, কখনও মহাপুরুষগণের সমালোচনা না

করিতে; এবং বলিতেন তাঁহাদের পরস্পরের তুলনা পূর্ব্বক কাহাকেও ছোট বা কাহাকেও বড় বলা অসঙ্গত ও অনিষ্টকর। মহেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রতি বৎসর মাঘ মাস পড়িলেই ব্রাহ্ম সমাজের পুরাতন গানগুলি তাঁহাকে গাহিতে শুনিতাম।

১। "এসেছে ব্রহ্ম নামের তরণী
কে যাবিরে তোরা আয় রে আয়।"…

২। "জাগ পুরবাসি, অমৃতের অধিকারী
নয়ন মেলিয়া দেখ পাপতাপহারী।"…ইত্যাদি

এই প্রিয় গানগুলি করিতে করিতে তাঁহার গভীর ভাব প্রকাশ পাইত। ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত কালে জীবনের প্রথম সময়ে কয়েকবার তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র সংস্পর্শে আসিয়া অলক্ষ্যে মহেন্দ্রনাথের ধর্ম্মভাব পরিপূর্ণতা লাভ করে, ইহা তাঁহার রচিত "শ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যান" নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থখানিতে প্রকাশ পাইয়াছে।

জ্ঞানপিপাসা ও পাঠে রুচি তাঁহার সহজাত গুণ। মহেন্দ্রনাথ যেখানে ভাল গ্রন্থাগার আছে জানিতেন, সেখান হইতে ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক বা প্রসিদ্ধ লোকের জীবনীগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পড়িতেন। আহার নিদ্রা ভুলিয়া মহাভারত পড়িতে আমিও দেখিয়াছি। শুনিয়াছি অনাহারের সময়ও তাঁহার পড়া বন্ধ হইত না। হঠাৎ পিতৃবিয়োগের পরে তাঁহার অর্থকষ্ট

চরমে উঠিয়াছিল, তখন তিনি স্কুলের ছাত্র। অনাহার অর্দ্ধাহার প্রায়ই ঘটিত। তাঁহার অন্য নেশা ছিল না। প্রথমাবধিই চা ও তামাক চলিত। তাঁহার ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান অগাধ; এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ মনে রাখিতে পারিতেন যে, সেরূপ অন্যত্র বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। এক একটী বিষয়ে বিভিন্ন লোকের বই পড়িয়া আপন মত স্থির করিতেন। লোকচরিত্র নিরূপণ করিতে তাঁহার মত লোক খুব কমই দেখা যায়। জ্যেষ্ঠের মত তিনিও ঐতিহাসিক বা জাগতিক ঘটনাবলী এক নূতন দৃষ্টি ভঙ্গিতে দেখিতে অভ্যস্ত। গতানুগতিক ধারায় ইঁহারা চিন্তা করিতেন না। সর্ব্বদাই বিদ্রোহ ভাবপূর্ণ অন্তরে সত্যের জন্য মন ছুটিয়াছে। তাঁহাদের ছিল, পরের কথায় নহে, নিজে সত্য প্রত্যক্ষ করিব, এই ভাবের প্রকৃতি। ইহা মানিয়া-লওয়া-প্রকৃতির লোকের বড় পছন্দ হইত না, এবং এই জন্য তৎকালে সকলের প্রিয়ও হইতে পারেন নাই। অনেকে দুই চারিদিন সঙ্গ করিয়া আসা যাওয়া বন্ধ করিয়া দিতেন। চির আচরিত ধারায় যন্ত্রের মত চলিতে, 'প্রভুর কি মহিমে' বলিয়া নয়ন জলে ভাসিতে, না বুঝিয়া পরের মত গ্রহণ বা পরের বাক্য ও শ্লোক উদ্ধৃত করিতে শুনিলে জ্যেষ্ঠের মত ইনিও ধৈর্য্য হারাইতেন। অনুকরণ বা মেদাটে ভাব একেবারে অপছন্দ করিতেন। তেজস্বীতা ও আত্মবিকাশের ঊর্দ্ধপ্রেরণা যাঁহার মধ্যে দেখিতেন, তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিতেন।

এই প্রসঙ্গে ১৯০২ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ঢাকায় অবস্থানকালের এক দিনকার কথা মনে পড়িতেছে;—ঢাকা ফরাসগঞ্জে মোহিনীবাবুর বৈঠকখানা হলঘরে বৈকাল বেলায় প্রায় নিত্যই নানা শ্রেণীর লোক সমাগম হইত। স্বামীজি উপস্থিত জনগণের বিবিধ বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। একদিন এক কলেজের যুবক স্বামীজিকে অনেক শ্লোক আবৃত্তি করিয়া কি এক কথা বুঝাইতে ছিলেন। তখন স্বামীজি একটু চঞ্চল হইয়া যুবক পণ্ডিতটীকে মধুর পরিহাসের সহিত বলিলেন, "বাপু হে, আমি পৃথিবীর নানা দেশের বড় বড় লাইব্রেরীর বইগুলি পড়ে এসেছি। পরের কথা শুনতে আর ভাল লাগছে না। তোমার এই মাথার খোলটার ভিতর থেকে কি কথা বের হয় তাহাই বল, শুনে সুখী হই। আত্মবিকাশের চেষ্টা কর, পরের উচ্ছিষ্ট ভোজনে তৃপ্ত থাকিও না। আপন অনুভবের দু'একটী কথার মূল্য পরের সহস্র কথারও অধিক জানিবে।" তদবধি ঢাকার যুবকগণের প্রাণে জ্ঞানের নূতন প্রেরণা জাগিল।

জ্যেষ্ঠের ভাব, ভাষা সকলই কনিষ্ঠ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত ও তাহাতে ভরপূর, তথাপি কনিষ্ঠ যে আপন স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বত্র বজায় রাখিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন ইহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহার জীবন, ভাব ও লেখা সমস্তই নিজস্ব; কোথাও অনুকরণের গন্ধ নাই। তবে জ্যেষ্ঠের দুইটী কথায় সর্ব্বদা খুব জোর দিয়া বলিতে শুনিতাম। প্রথমটী—'Hands

off, let others be free',—বন্ধন খুলে দেও—লোকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখুক। মহেন্দ্রনাথকে কখনও 'এই কর, এই করিও না' বলিয়া উপদেশ দিতে শুনি নাই বা আপন ভাব অপরে চাপাইতে দেখি নাই। সর্ব্বদা দেশাচার, লোকাচার বা শিষ্টাচারের অষ্টপাশ ছিন্ন করিয়া সত্যের সন্মুখীন হইবার প্রেরণা দিতেন। স্বামীজির আর একটী কথাও পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া বুঝাইতেন—"Decoction of Western materialism with Eastern flavour"—পাশ্চাত্য কর্ম্মপদ্ধতি ও বিস্তার ভারতীয় অধ্যাত্ম ধর্ম্ম বুদ্ধিতে সৌরভ যুক্ত করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। জড়বাদ ও অধ্যাত্ম-বাদ বিরোধী নহে—পরস্পরের পরিপূরক—অধ্যাত্মের জড় সাজ, আর জড়ের অধ্যাত্ম অন্তর!

কলিকাতা, শিমলা, ৩নং গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীটের পৈত্রিক বাসভবনে যখন প্রথম তাঁহার সহিত মিলিত হই, তখন তাঁহার জীবনের প্রৌঢ় কাল। ইংলণ্ডের বৃটীশ মিউজিয়মে অধ্যয়ন সমাপনান্তে সিরিয়া, তুর্কী, আর্ম্মেনিয়া, প্যালেষ্টাইন, মিশর ও পারস্য এবং ভারতবর্ষের সিন্ধু ও কাশ্মীর প্রভৃতি দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লইয়া এবং বহু গ্রন্থ পাঠ দ্বারা পাণ্ডিত্য ও প্রবীণতা অর্জ্জন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময় হইতে কতিপয় বৎসর তাঁহার জ্ঞানের পরিপাক প্রক্রিয়া চলিতেছিল। তখন তিনি কলেজ পরিত্যক্ত ছাত্র বিশেষ; একটা কি বলিবার আছে, প্রকাশের ভাষা আসি-

তেছে না। আমরা এই সময়েই তাঁহার সহিত মিলিত হই। প্রায় তিন বৎসর তাঁহার সঙ্গ লাভ করিবার পরে ১৯১৪ সালের মাঝামাঝি প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে স্বামী সেবানন্দের সঙ্গে হঠাৎ আমি শ্রীবৃন্দাবন ধামে চলিয়া যাই। তথায় যাইয়া রামকৃষ্ণ-মিশন সেবাশ্রমে (তখন কালাবাবুর কুঞ্জে—বংশীবটে) সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হই। তিনিও কয়েক মাস পরে বৃন্দাবনে আসিয়া সেবাশ্রমে বাস করিতে থাকেন।

ইংরাজী ১৯১১-১৪ এই তিন সাল মধ্যে কলিকাতায় মহেন্দ্রনাথের যে সকল ছোট খাট ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহার বিশেষ কিছু মনে নাই। দুইটীর কথা মনে পড়িল, তাহার প্রথমটী—

দীনবন্ধু (দীন মহম্মদ) নামে এক ভক্ত পাঞ্জাবী মুসলমান যুবক, ইংরাজী ও উর্দ্দু ভাষায় পণ্ডিত, স্বামীজির বক্তৃতাদি পাঠ করিয়া ঠাকুরের সমন্বয় ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বেলুড় মঠে চলিয়া আসেন। তথায় কিছু দিন অবস্থানের পর তাঁহার দ্বারা স্বামীজির গ্রন্থ উর্দ্দুভাষায় অনুবাদ করিবার নিমিত্ত বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে মহেন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া নিজ বাটীতে তাঁহার নাম ও বেশ বদলাইয়া হিন্দু বলিয়া স্থান দেন এবং তাঁহার সমস্ত ব্যয় বহন করেন। দীনবন্ধু পাশের ঘরে বাস করিতেন এবং মহেন্দ্রনাথের নিকট শব্দার্থ ও ভাবার্থ বুঝিয়া লইয়া মহা উৎসাহের সহিত অনুবাদ কার্য্য দ্রুত চালাইতে থাকেন।

ক্রমে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, প্রভৃতি গ্রন্থ উর্দ্দু ভাষায় অনূদিত হয়। ইহাতে বৎসরাধিক কাল কাটিয়া যায়। পরে বিশেষ প্রয়োজনে একবার দীনবন্ধু দেশে যাইতে বাধ্য হন। তথায় কিছুদিন রোগে ভুগিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার হস্ত লিখিত খাতাগুলি এক বিরুদ্ধ মতের ব্যক্তির হস্তগত হয় এবং তাহা আর প্রকাশিত হইতে পারে নাই।

দ্বিতীয়টী—সাধু নাগ মহাশয়ের স্ত্রী চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়া আসিলে মহেন্দ্রনাথ শিমলাতে আপন বাটীর সন্নিকটে এক ভাড়াটীয়া বাড়ীতে তাঁহাকে দুই তিন মাস রাখিয়া আপন তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা করান এবং আরোগ্যান্তে দেশে পাঠাইয়া দেন।

এইরূপ আরও অনেক ছোট ছোট ব্যাপার ভক্তগণ সাহায্যে সম্পাদন করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার নিকট দরিদ্র ছাত্র বা গৃহস্থ প্রার্থী হইয়া আসিলে কখনও বিমুখ হইয়া যাইতে দেখি নাই। এই সমুদয়ের বাহিরে কোন প্রকাশ না থাকায় আমাদের অনেকেরই তাহা জানিবার সুযোগ ঘটে নাই। মহেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্তের সংবাদ বাম হস্ত জানিতে পারিত না। তিনি সমুদ্রের ন্যায় অতল গভীর।

পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণার্থে মহেন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য দেশে বাস ও ভ্রমণের কথা তাঁহার নিকট এবং তাঁহার বন্ধু সিন্ধুদেশবাসী সওদাগর উধামলের নিকট এই তিন বৎসরকাল

মধ্যে যাহা শুনিয়াছি তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া এই স্তবক সমাপন করিতেছি।

ইংরাজী ১৮৯৪ সালে মহেন্দ্রনাথ ৺হরিদ্বার, ঋষিকেশ প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করিতে যান। তথায় ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। পরে সিমলা পাহাড়ে বেড়াইতে যান। সেখানেও টাইফয়েড জ্বর হয়। ম্যালেরিয়া ও টাইফয়েড জ্বরে বৎসরাধিক কাল ভোগেন। আরোগ্যান্তে ১৮৯৬ সালের এপ্রিল মাসে লণ্ডন যাত্রা করেন। তথায় যাইয়া ব্যারিষ্টারী পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময় লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত মিলিত হন। তাঁহার অনভিপ্রেত বলিয়া আইন চর্চ্চা ছাড়িয়া দেন। তৎপরে জ্ঞানপিপাসা তৃপ্তির জন্য বৃটীশ মিউজিয়মে নিয়মিতরূপে অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকেন। প্রায় দেড় বৎসরকাল তথায় অধ্যয়ন করিবার পরে, সম্ভবতঃ অর্থাভাবে, তাঁহাকে লণ্ডন পরিত্যাগ করিতে হয় এবং স্বদেশে ফিরিবার পথে তিনি পর্য্যটকরূপে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান।

এইবারে তাঁহার পরিব্রাজক জীবন শুরু হয়। এখন হইতে পাঁচ বৎসর কাল আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার প্রসিদ্ধ স্থান-গুলিতে ঘুরিয়া বেড়ান। প্রথমে জিব্রলটারে যান। কিছু দিন পর তথা হইতে মরক্কো গমন করেন। মরক্কো হইতে মাণ্টা দ্বীপে যান। সেখান হইতে আলেকজাণ্ড্রিয়া হইয়া কায়রোতে গমন করেন। তথায় তিন মাস অবস্থান করেন এবং সাহারা মরুভূমিস্থ পিরামীড্ প্রভৃতি দর্শন করেন। তাহার পরে জাফা

হইয়া জেরুজালেমে যাইয়া চার মাস বাস করেন। তৎপরে বেরুট হইয়া দামাস্কাস যাইয়া আড়াই মাস কাটান। সর্ব্বত্রই পরম সৌহার্দ্দ্য ও আতিথ্য যে লাভ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ অনেকবার করিতে শুনিয়াছি।

ইহার পরে ত্রিপলী অঞ্চলে তুই তিন মাস কাটাইয়া প্রথমে কনস্টানন্টিনোপল যান; পরে সোফিয়া, বুলগেরিয়া, বলকান-পর্ব্বত, সুলীনা প্রভৃতি দেশে বেড়াইয়া পুনরায় কনস্টানন্টিনোপলে আসিয়া দেড় বৎসর অবস্থান করেন ও তুর্কী ভাষায় কথা বলিতে শিখেন। এখানে সিন্ধী সদাগর উধামলের সহিত পরিচিত হন। তিনি ইউরোপ ও চীন প্রভৃতি নানা দেশে ঘুরিয়া এজেণ্টরূপে ব্যবসা করিতেন ও নানা ভাষা জানিতেন। মহেন্দ্রনাথের উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে, কন্ষ্টান্টিনোপলে থাকাকালীন ধর্ম্মযাজকদিগের সহিত তাঁহার মাঝে মাঝে তর্ক বিতর্ক হইত। তাঁহারা মহেন্দ্রনাথের বুদ্ধি ও বিদ্যার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। বিদেশী ও বিধর্ম্মীর নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহারা অপমানিত বোধ করিতেন। এক বার এক সভায় তুমুল তর্কের পর তাঁহারা পরাজিত হইয়া মহেন্দ্রনাথের হত্যার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করেন। উধামল তাঁহা জানিতে পারিয়া কৌশলক্রমে মহেন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। তুর্কী দেশ হইতে আরমেনিয়া ও ককাসাস পর্ব্বতে যান। তথা হইতে তিনি কাস্পিয়নসাগর, রেটু

তিফিলিস্, বাকু, ক্রীনিমাভোচ ( বালির উপরে নির্ম্মিত সহর ), মেসিদসাহ, মাজান্দ্রাদ্, এলব্রুজ পর্ব্বত, তেহারাণ, কোচ্ খোরাশান, ইস্পাহান প্রভৃতি দেশে ঘুরিয়া বেড়ান। কিছু কাল তেহারাণে পারস্যরাজ-মন্ত্রীর বাড়ীতে বিশেষ সম্মানের সহিত গৃহ-শিক্ষকের কাজ করেন। তাঁহার পুত্রকে ইংরাজী পড়াইতেন। উক্ত পরিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্টতা জন্মে। এখানে মহেন্দ্রনাথ পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন ও অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। তেহারাণ হইতে দক্ষিণ পারস্যের অরণ্য প্রদেশে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হন। শীতের সময় মেসাপটে-মিয়ায় দশ দিন ক্রমাগত বরফের মধ্যদিয়া চলিয়া অমরাতে উপনীত হন। তথা হইতে, জাহাজে করিয়া প্রথমে বোগদাদ যান, পরে সেখান হইতে বস্‌রা হইয়া সর্ব্বশেষে করাচীতে আসিয়া আট দিনে পৌঁছেন। করাচীতে কিছুকাল সংবাদ-পত্রের সম্পাদকের কাজ করিয়াছিলেন। করাচী হইতে কাশ্মীর গমন করেন। তৎপরে ১৯০২ সালে জুলাই মাসের শেষে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন স্বামীজি দেহ রক্ষা করিয়াছেন।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পথ ঘাট ও যানবাহনের অনুন্নত অবস্থায় অজানা দেশে, অপরিচিত সমাজে ও অজ্ঞাত ভাষা-ভাষীদের মধ্যে যৌবনে একাকী ধর্ম্ম, বিদ্যা ও বুদ্ধি মাত্র সম্বল করিয়া দীর্ঘ পাঁচ বৎসর মহেন্দ্রনাথের দেশ পর্য্যটনের ইতিহাস এক রোমাঞ্চকর কাহিনী বিশেষ। তাহা তাঁহার দ্বারাই রচিত

হইলে ভাল হইত। ইহার অতি অল্প কথাই আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। নিজেও স্বতন্ত্র কোথাও বিস্তারিত লিখিয়া প্রকাশ করেন নাই। সম্প্রতি প্রকাশিত ( ১৯৩৪ সালে লিখিত ) 'National Wealth' নামক গ্রন্থখানিতে পর্য্যটক জীবনের কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। আপন অভিজ্ঞতা ৪০ বৎসর পরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের নানা স্থানের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, কল-কারখানা ও শ্রমিক সমস্যার বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা এশিয়ার আর্থিক উন্নতি সমাধানের উপায় দেখাইয়াছেন। ইহা পর্য্যটকের সূক্ষ্মদর্শিতা ও স্মৃতিশক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে মহেন্দ্রনাথের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের সামান্য উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

এইরূপ দুঃসাহসিক ভ্রমণকার্য্যের কথা সচরাচর বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। কত বার নির্জ্জনে নিশীথে মরুদেশে ভীষণকায় দস্যুদলের হস্তে পড়িয়া তাহাদের সেবাদ্বারা পথ-শ্রান্তি দূর করিয়াছেন, ও হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ অরণ্যপথ নিরাপদে পার হইয়া আসিয়াছেন। কখনও বা একাকী পথশ্রান্ত অবস্থায় রাত্রিতে গিরিগহ্বরে আশ্রয় লইয়াছেন, বাহিরে সন্তানবক্ষে বাঘিনী প্রহরীর কার্য্য করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছে। নিদারুণ শীতে দিনের পর দিন বরফের মধ্য দিয়া পায়ে হাঁটিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া গিয়াছেন এবং জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্তির জন্য দুর্গম ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপত্যকলা দর্শন করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশের কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য,

কল-কারখানা, হাট-বাজার, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম, লোকচরিত্র এবং নানা স্তরের সমাজ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। কে যে অলক্ষ্যে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করিত তাহা অনুভব করিয়া ভাবের ঘোরে তিনি দেশ দেশান্তরে একাকী নির্ভয়ে নির্ভাবনায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। ইহাকে বিরাগী বিদ্যার্থীর সাধক জীবনের রহস্যময় অজ্ঞাত ইতিহাস ব্যতীত আর কি বলিব? এইরূপ অদম্য উৎসাহ, সৎসাহস ও আত্মাবল অতি বিরল!

তাঁহার সহিত তাঁহার নিজ হস্ত-লিখিত অনেক গুলি খাতা কলিকাতা আসিয়াছিল; সম্ভবতঃ তাহাতে নিজ পর্য্যটক জীবনের বিবরণ লেখা ছিল। আমি খাতাগুলি দেখিয়াছি, কিন্তু পড়িবার সুযোগ পাই নাই। সকলই ইংরাজী ভাষায় লেখা ছিল। বাংলা ভাষায় তখন তিনি লিখিতে জানিতেন না। এই বইগুলি এবং পরবর্ত্তী কালে লেখা অনেক খাতা (মোট ২৫।৩০ খানার কম হইবে না) স্বদেশী-যুগের খানা-তল্লাসীর ভয়ে এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিল। খাতাগুলির ভিতর কি লেখা ছিল জানি না। কিন্তু সে গুলি যে সকলের ত্রাসের কারণ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। একদিন এক বন্ধুবর খাতাগুলি লইয়া এমন বিপদে পড়েন যে, প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নিতে একটী একটী করিয়া খাতা আহুতি প্রদানদ্বারা সকলকে আতঙ্ক হইতে মুক্ত করেন। মহেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গ্রন্থ রচনার ইতিহাস এইরূপে সমাপ্ত হয়।

---

## দ্বিতীয় স্তবক

### ( শ্রীবৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম )

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ১৯১৪ সালের জুলাই মাস নাগাদ আমি স্বামী সেবানন্দের সহিত হঠাৎ বৃন্দাবনে চলিয়া যাই। যাইবার বিশেষ কারণ ছিল। মহেন্দ্রনাথ ইতি পূর্ব্বে ১৯১২-১৩ সালে ব্রজমণ্ডলের প্রধান প্রধান স্থান, যথা—নন্দগ্রাম বর্ষাণা, গিরিগোবর্দ্ধন, মথুরা ও বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান একবার পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণের বিবরণ 'ব্রজধাম-দর্শন' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আমাদের নিকট ব্রজমণ্ডলের যে মধুর ভাবের বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া তদ্দর্শনের জন্য আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিল। বন্ধুবর শ্রীসেবানন্দের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে মন চাহিল না। বলিবা মাত্রই যাত্রা করিলাম। পথে ৺কাশী সেবাশ্রমে দুই দিন বিশ্রাম করিয়াছিলাম। তখন পূজ্যপাদ রাখাল মহারাজ কাশী সেবাশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা বৃন্দাবনে যাইব শুনিয়া তিনি খুব খুসী হইলেন। বৃন্দাবনের নামে যেন আত্মহারা হইয়া গেলেন। কত কথা বলিলেন—"অন্যত্র দশ বৎসরের তপস্যার ফল ব্রজমণ্ডলে দুই বৎসরে হয়। বৃন্দাবনের কি মধুর পবিত্র জাগ্রত ভাব! সেখানে রাধারমণজির মন্দিরে ঠাকুরসেবা খুব নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে হইতেছে। ঠাকুর দর্শন করিও। আমাকে কড়াই ভাজা প্রসাদ পাঠাইও।"

ইত্যাদি কত কথা বলিলেন। আমাদিগকে আরও দুই দিন তাঁহার কাছে থাকিতে বলিলেন। আমরা বৃন্দাবনের টিকিট কাটিয়া গিয়াছিলাম এবং তথায় যাইবার জন্য এত উতলা হইয়াছিলাম যে, আর অপেক্ষা করিলাম না। তাঁহার পদধূলি লইয়া তার পর দিনই চলিয়া গেলাম। তিনি উৎসাহিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

যখন বৃন্দাবনের রামকৃষ্ণ-মিশন-সেবাশ্রমে যাই, তখন উহার বাল্যাবস্থা। বংশীবটে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ভক্তবর বলরাম-বাবুর পূর্ব্বপুরুষকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কুঞ্জের বহির্ভাগে ইহা প্রথমে স্থাপিত হয়। মন্দিরের প্রধান কর্ম্মচারী বা কামদার ছিলেন এক অতি স্থূল কৃষ্ণকায় ব্যক্তি। তাঁহার আকৃতির বৈশিষ্ট্য হইতে এই মন্দিরের প্রসিদ্ধি হয় "কালাবাবুর কুঞ্জ" বলিয়া (কুঞ্জ অর্থে মন্দির বুঝায়) এবং তদনুসারে পরে সেবাশ্রমও "কালাবাবুর দাওয়াইখানা" বলিয়া খ্যাত হইয়া পড়ে। এই কুঞ্জ একেবারে যমুনার উপরে। পশ্চিম দিকে বিশাল যমুনা বহিয়া যাইতেছে, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান মাত্র পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার পায়ে হাঁটার অপ্রশস্ত রাস্তা। উত্তরে পাথর বাঁধান প্রশস্ত সড়ক, যমুনা-ঘাট হইতে সহরে চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার ঠিক অপর পার্শ্বে প্রসিদ্ধ বংশীবটের কুঞ্জ। এখানে নিত্য প্রাতে শ্রীকৃষ্ণলীলার যাত্রা-গান নৃত্য ও গীতসহ হইয়া থাকে। শ্রোতা—যাত্রী, স্নানার্থী ও রোগী।

এক এক দিনকার যাত্রা গানের দৃশ্য—গানসহ অভিনয়—

মহেন্দ্রনাথের ও আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিত। তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ এখানে না দিলে বংশীবটের মাহাত্ম্য বর্ণনা অসম্পূর্ণ লাগিতেছে। তাহা এই :—

রাজবেশে দ্বারকার সিংহাসনে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহাকে ঘিরিয়া দীনবেশে পথশ্রান্ত ধূলিপদে রাখাল বালকগণ আর ব্রজবাসিনীরা ঘুরিয়া ফিরিয়া গান গাহিতেছে। মাঝে মাঝে নিজ বক্ষে বাম হাত আর দক্ষিণ হাতে শ্রীকৃষ্ণের চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিতেছে। গানটীর কিয়ৎ অংশ মনে আছে, তাহা এইরূপ :—

"তুম্ চলে আইও, তুম্ ভাগে আইও,
রে, দেলকা দেও নাগর !!
বৃন্দাবন বংশী—বংশীতট তেয়াগিও,
তেয়াগিও যমুনাকা নিরমল নীর !!!
তুম্ চলে আইও, তুম্ ভাগে আইও" ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ মুকুট সিংহাসনে রাখিয়া সখাগণকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে শ্রোতাগণও আত্মহারা হইয়া স্থির বসিয়া রহিয়াছে। প্রেমের এই সকল দৃশ্য মর্ত্তে দুর্ল্লভ! নিত্যই প্রাতে তাহার কোন এক রূপের অভিনয় বংশীবটে হইত। আমাদের শুনিবার অবসর খুব কমই মিলিত।

কালাবাবুর কুঞ্জ তিন ভাগে বিভক্ত। সর্ব্ব পশ্চাতে অন্দর

মহল। প্রকাণ্ড এক দোতলা বাড়ী; ৫।৬টী পরিবার তথায় এক সঙ্গে বাস করিতে পারে। মধ্যের মহলে রাধা-গোবিন্দের মন্দির, তৎসম্মুখে মাঝারি রকমের চক্‌মিলান আঙ্গিনা ও চতুর্দ্দিকে চওড়া বারাণ্ডাযুক্ত বড় বড় ঘর। ইহাতেও বহু যাত্রী এক সঙ্গে বাস করিতে পারে। এইখানে সদাই পত্র-পুষ্পে শোভিত একটী বিশাল মালতীলতা সমুদয় আঙ্গিনাটী —মধ্যস্থল ও ছাদের কিয়দংশ—আচ্ছাদন করিয়া মঞ্চের উপর বিরাজ করিতেছিল। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে পুষ্পের সৌরভ, মধুমক্ষিকার গুঞ্জন এবং নবপল্লবের ছায়াতল বাহিরের 'লূ' বা গরম হল্‌কা হাওয়ার প্রতিকারকরূপে দ্বিপ্রহরে সকলের বিশেষ উপভোগ্য ছিল। রাত্রিকালে উপরে খোলা ছাদে আমরা সকলে শয়ন করিতাম। মহেন্দ্রনাথ নিজ ঘরেই শয়ন করিতেন।

এই আঙ্গিনার সম্মুখের দিকে প্রবেশের পথে প্রশস্ত ও উচ্চ দরজাযুক্ত একটী ঘর, তাহাতে দ্বারবান্ বাস করিত। এই দরজার বাহিরের দিকে দুই পার্শ্বে দুইটী কোমর সমান উঁচু বেদী আছে, ইহা চারি হাত প্রশস্ত হইবে। তাহার উপর পাথরের সরু থাম ও তদুপরি চালা। সকলই চুনারের পাথরের নির্ম্মিত ও কারুকার্য্যযুক্ত। দেখিতে অতি সুন্দর। এই বেদীর উপর মহেন্দ্রনাথ বৃন্দাবনে গেলে আসন লইতেন।

ইহারই সম্মুখে উচ্চ প্রাচীর ঘেরা বাহিরের আঙ্গিনা। জমির পরিমাণ অর্দ্ধবিঘার কিছু কম হইবে। প্রতি খণ্ডের

আয়তনও প্রায় এইরূপ হইবে। বাহিরের খণ্ডের পশ্চিমে যমুনা ও লাগ উত্তরে রাস্তা এবং বিপরীত দিকে রাস্তার উপরে বংশীবট কুঞ্জ। পশ্চিমে যমুনার দিকের প্রাচীরের মধ্য-স্থলে প্রকাণ্ড এক দরজা আছে। তাহার মধ্য দিয়া যমুনার বিশাল বিস্তার ও দিগন্তব্যাপী মাঠ এবং তাহার মাঝে মাঝে বনানীর দৃশ্য দর্শকের প্রাণে অনন্তদেবকে স্মরণ করাইয়া দিত। এই বাহিরের আঙ্গিনার উত্তর দিকের মধ্যস্থলে পাথরের রাস্তার উপর এই কুঞ্জে প্রবেশের দ্বার—ইহা এক বড় দেউড়ী বিশেষ। দেউড়ীর উপর নহবতখানা। ইহাও কারুকার্য্য যুক্ত পাথরের নির্ম্মিত ও দেখিতে মনোরম। দেউড়ীর সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে রাস্তার উপর ভিতরমুখো সাম্‌না সাম্‌নি ছোট এক আঙ্গিনার দুইদিকে দুইটী ছোট ঘর আছে; তাহার একটীতে ঠাকুর ঘর ও অপরটীতে মহেন্দ্রনাথ ও আমি রাত্রি যাপন করিতাম। ইহা ছাড়া মধ্যের আঙ্গিনার সংলগ্ন বহির্মুখো তিনটী মাঝারি রকমের ঘরও ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ এই পাঁচখানি ঘর লইয়া সর্ব্বপ্রথম সেবাশ্রমের কাজ আরম্ভ হয়। ক্রমে আরও চারিখানি মাঝারি ঘর (পাকা দেওয়াল ও খড়ের চালা) প্রস্তুত করা হয়। মোট এই নয়খানি ঘরের মধ্যে সতেরটী রোগীর বেড্, আউটডোর ডিস্‌পেনসারী, অপারেশন রুম, প্রসূতী-আগার, মুমূর্ষু রোগী রাখিবার ঘর ও কর্ম্মীদের শয়নের ব্যবস্থা করা হয়। উপরের নহবতখানার খোলা ঘরটীতে বেড়া দিয়া উহা রান্নাঘরে পরিণত করা হয়।

কুঞ্জের উক্ত তিন খণ্ডে তিনটী কূপ ছিল। বাহিরের সেবাশ্রমে কূপের জল যমুনার সন্নিকটে বলিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বাহির হইতে বহু লোক উহার জল লইতে আসিত। এই বাহিরের খণ্ড হইতে মধ্য খণ্ডে প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে আট দশ হাত দক্ষিণদিকে একটী বিশাল নিম্ববৃক্ষ চতুর্দ্দিকে শাখা ও ছায়া বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। ইহার গোড়ায় বসিবার উচ্চস্থান প্রশস্ত এবং বাঁধান। ইহা সকলেরই বিশ্রাম ও উপভোগের স্থান ছিল। প্রাতঃকাল হইতেই রোগিগণ এখানে আসিয়া অপেক্ষা করিত।

সেবাশ্রমে সাধারণতঃ বাহিরের রোগী-সংখ্যা ৭০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত হইত। কখন কখন বেশীও হইত। ইহাদের মধ্য হইতে নিত্যই দুই-একটী রোগীকে বিশেষ চিকিৎসার জন্য আশ্রমে রাখা হইত। ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা ও দোলের সময় রোগীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইত। সেই সময় এক এক বৎসর বসন্ত ও কলেরা রোগীর সংখ্যা এত অধিক হইত যে, আশ্রমের ঘরে ও বাহিরে রাখিবার স্থান সংকুলান হইত না। বহু রোগী রাস্তা-ঘাটে পড়িয়া থাকিত। সেবাশ্রম স্থাপনের পূর্ব্বে বিনা চিকিৎসায় অসহায় অসংখ্য যাত্রীর এই ভাবে বৃন্দাবনের রজঃ প্রাপ্তি হইত। তাহাদিগকে আত্মীয় স্বজন ভয়ে পরিত্যাগ করিয়া পথে ফেলিয়া যাইত। তাহাদের কেহ দেখিবার থাকিত না। সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর হইতে বহু যাত্রী সেবকগণের সেবা ও যত্নে জীবন লাভ করিত,

এবং অনেকে দেশে যাইয়া সেবা দর্শন বা গ্রহণ জনিত কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিয়মিত ভাবে অর্থ সাহায্য করিতেন; এ বিষয়ে মাতৃজাতির দান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং তদ্দারাই সেবাশ্রমের ক্রমোন্নতি সাধিত হইতে থাকে। অবশেষে ১৯১৭ সালে যমুনার উপর পানিঘাটে ৩২ বিঘা জমি (৮ বিঘা যমুনার গর্ভে) বাকী ২৪ বিঘা নামমাত্র মূল্যে খরিদ করিয়া, তথায় নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেবাশ্রম উঠিয়া যায়। ইহা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন ও প্রশস্ত স্থান।

আমরা উভয়ে চারিবার বৃন্দাবনে যাই। তন্মধ্যে প্রথম দুই বার কালাবাবুর কুঞ্জের সেবাশ্রমে অবস্থান করি। তৃতীয়-বারে কালাবাবুর কুঞ্জে কয়েকমাস থাকিবার পর এই পাণি-ঘাটের নূতন আশ্রমে উঠিয়া আসি। তথায় অল্প দিন বাস করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যাই। ইহার পরে চতুর্থবারে ১৯১৯ সালে মহেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মচারি-চিন্তাহরণ ও আমি লাহোর ফেরত এই নূতন আশ্রমে যাইয়া এক বৎসরের অধিক কাল অবস্থান করি।

এই আশ্রমের প্রথম ও প্রধান কর্ম্মী ছিলেন ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথ বা নাহু মহারাজ এবং বুড়ো বাবা (শ্রীশ বাবু) পরে শ্রীধরানন্দ স্বামী। অপরাপর সেবকগণ মধ্যে স্বামী সেবানন্দ, ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকুমার, ব্রঃ সাধন এবং ব্রহ্মচারি-চিন্তাহরণ আর শ্রীমন্মথনাথ চাটার্জ্জি মহাশয়ের নাম মনে পড়িতেছে। তাঁহারা সকলেই অক্লান্ত ও নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মী ছিলেন। আরও

বহু কর্ম্মী আসিয়া সেবাকার্য্যে সাহায্য করিতেন ও কিছু দিন পরে অন্যত্র চলিয়া যাইতেন। এই সমুদয়ের স্বতঃ প্রণোদিত সেবাকার্য্যের উৎসাহ দেখিলে প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিত। সেবাশ্রমের স্বচ্ছলতা তখন হয় নাই। কর্ম্মীদেরও ছিল না। কর্ম্মীদের খাদ্য অতিশয় সাধারণ ছিল। সেবাশ্রম হইতে মোটা ভাত মোটা রুটী অড়হর ডাল (ক্কচিৎ উড়ৎকা ডাল), আর একটা শাক ভাজি মাত্র দুই বেলা মিলিত। তাহাই আনন্দ করিয়া তাঁহারা খাইতেন। কখন কখন মাসে দুই তিন বারের বেশী নয়, লালা বাবুর মন্দির হইতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ প্রসাদ আসিত। তাহার অংশ হাতে হাতে বিতরিত হইত। আমরা সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিতাম। অমৃত ভোগেও বুঝি এত আনন্দ হয় না, আমাদের তখন মনের অবস্থা এত সরস ছিল। জুতা, জামা, বহির্বাস (অর্দ্ধখণ্ড) আমাদের নিজেদেরই বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হইত। কিন্তু তজ্জন্য কাহারও মনে দুঃখ হইত না। কেন না, তাহার জন্য কেহ তথায় আসে নাই। স্বামীজির কথার মর্ম্মানুযায়ী পরার্থে আত্মসুখ বলিদানের সৌভাগ্য যে লাভ হইয়াছে ইহাই সকলের বড় আনন্দের বিষয় ছিল।

স্বামীজির শিষ্য ও সেবক নাত্থ মহারাজ সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া সর্ব্বপ্রথম এই সেবাশ্রমে আসেন। প্রথমাবস্থায় একা নিজেই সকল কাজ করিতেন;—রোগীর মল-মূত্র পরিষ্কার, তাহার ঘর ধোয়া, পোছা, মাথা ধোয়ান, কাপড় পরান

বিছানা করা ও ঔষধ পথ্য খাওয়ান ইত্যাদি যাবতীয় কাজই নিজের হাতে মায়ের মত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। নাতু মহারাজ যখন প্রথম সেবাশ্রমে যোগদান করেন তখন তাঁহার চিকিৎসা বা সেবা সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। শুধু গুরুসেবার ফল ও আশীর্ব্বাদ সম্বল করিয়া সেবাকার্য্যে আত্মোৎসর্গ করেন এবং অধ্যবসায় বলে চিকিৎসা শাস্ত্র ( হোমিও প্যাথিক, এলোপ্যাথিক এবং সার্জ্জারি ) অতি সুন্দর রূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি তাঁহার সেবা ও চিকিৎসাগুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগী আরোগ্য লাভ করিত। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে আশ্রমের পাশ করা ডাক্তারগণের চিকিৎসাধীনে রোগী সেরূপ সহজে রোগমুক্ত হইত না। তাঁহার উপর লোকের অগাধ বিশ্বাস জন্মিয়া ছিল। প্রায়ই দূর দূর দেশ হইতে বহু রোগী আসিয়া তাঁহার দ্বারা আশ্রমে চিকিৎসিত হইত এবং অল্প দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া যাইত। নাতু মহারাজ গুরুর আদেশে দীর্ঘকাল নারায়ণ জ্ঞানে নরের সেবা করিয়া দেহ পাত করিয়া স্বধামে চলিয়া যান। তাঁহার মত কর্ম্মী আর দ্বিতীয় একটী আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় নাই। নাতু মহারাজ বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও মহেন্দ্রনাথ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান দিতেন। মহেন্দ্র-নাথকেও নাতু মহারাজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত শ্রদ্ধা করিতেন। আমাদের সকলের মধ্যেই সৌভ্রাত্র জন্মিয়াছিল।

আশ্রমের এই সেবাকার্য্যের মর্য্যাদা দান করিতে আর

একটী সাধুকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার নাম কিষণজি। মহেন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'ভগবান্' উপাধি দিয়াছিলেন এবং অতি শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাকে "কিষণজি ভগবান্" বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ তাঁহার লিখিত "সাধু চতুষ্টয়" গ্রন্থে কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়াছেন। আশ্রমের কর্ম্মী অসুস্থ হইলে বা তাঁহাদের অভাব দেখিলেই কিষণজি আসিয়া সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। এমনও দিন গিয়াছে যে, তাঁহাকে একাই বাজার করা, আনাজ কোটা ও পাচক অভাবে রান্না করা এবং রোগীদের চারি বেলা পথ্য বিতরণ করিতে হইয়াছে। এমন কি, তাঁহাদের মল-মূত্রের পাত্রও বাহির করিয়া দিতে হইয়াছে। তিনি এই সকল কাজ একাই নিজ হস্তে করিতেন। ইহাতে তাঁহার মনে কোনরূপ সংকোচ বা ঘৃণা আসিত না। তিনি সারা জীবন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব সাধু ছিলেন। এই সকল কাজ অতি ঘৃণার কাজ; দেহ অশুচি হয় বলিয়া সচরাচর সাধুদিগকে করিতে দেখা যায় না। তিনি কিন্তু শেষ জীবনে এই সকল কাজ পবিত্র বলিয়া আনন্দের সহিত করিয়াছেন। কর্ম্মীরা সুস্থ হইলেই তিনি নিজ কুটিরে চলিয়া যাইতেন। তিনি প্রায় প্রত্যহই একবার আমাদের দর্শন দিতে আসিতেন এবং মহেন্দ্রনাথের সহিত আলাপ ঠাট্টা তামাসা করিয়া সকলকে আমোদিত করিয়া যাইতেন। এমন প্রেমিক লোক জগতে দুর্লভ।

কর্ম্মীদের মধ্যে তিনজনের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

১। স্বামী সেবানন্দজি প্রথম সময়কার কর্ম্মী। তিনি প্রেমিক ও সদা আনন্দময় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মের মাদকতা ছিল—যাবতীয় কর্ম্মই একা করিতে চাহিতেন। বিশ্রামের প্রয়োজন তাঁর বড় হইত না। তিন চারি বৎসর বৃন্দাবন সেবাশ্রমে কাজ করিয়া লাহোরে যাইয়া এক সেবাশ্রম স্থাপন করেন। তাহা উঠিয়া যাইবার পরে তিনি হিমালয়ে তপস্যা করিতে যান। পরে তাঁহার আর কোন সংবাদ জানা যায় নাই।

২। ব্রহ্মচারি-চিন্তাহরণ। আমারা বৃন্দাবনে প্রথম বারে যাইবার অল্প দিন পরে তিনি আসিয়া সেবাশ্রমে যোগদান করেন। তাঁহার কর্ম্মশক্তি অসীম; স্নানাহার ভুলিয়া সর্ব্বক্ষণই কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতেন। সদাই তাঁর সুকণ্ঠে গানের দু একটী কলি ধ্বনিত হইত—তাহা সেব্য-সেবক উভয়ের প্রাণেই উৎসাহ সঞ্চার করিত। তিনি সেবাশ্রমের উন্নতি সাধন ও রোগিগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট থাকিতেন। এক এক বার কঠিন পীড়াগ্রস্থ হইয়া পড়িতেন, আরোগ্য হইয়াই পুনরায় সেবাকার্য্যে লাগিয়া যাইতেন। আপন প্রাণের মমতা তাঁহার ছিল না। ভয় বলিয়া এক বস্তু তাঁহার চির অজ্ঞাত। জীবিতের ও মৃতের সৎকার সমানে চালাইতেন। তাঁহার জীবনের ব্রতই হইল পরোপকার-সাধন—জগতের কল্যাণ করা। নিজের প্রতি লক্ষ্য মোটেই তাঁহার ছিল না। তিনি প্রায় পাঁচ বৎসর বৃন্দাবন সেবাশ্রমে ছিলেন। পরে রাজনৈতিক আন্দোলনে

যোগ দেন এবং নির্যাতিত হন। তৎপরে দীন দরিদ্রের সেবাব্রত লইয়া ফরিদপুরের এক গ্রামে আশ্রম স্থাপন করেন।

৩। সকলের প্রিয় অপর এক কর্ম্মী ছিলেন, ব্রহ্মচারী কৃষ্ণ-কুমার ; পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন—নাম হয় স্বামী কৃষ্ণানন্দ। তাঁহার মত স্বল্প ও মধুরভাষী কুশলকর্ম্মী অতি বিরল। এই সকল কর্ম্মিগণ আশ্রমের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কৃষ্ণানন্দজি এখন কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তপস্যায় জীবন যাপন করিতেছেন।

নাডু মহারাজ সেবাশ্রমের আদি সময়কার অনেক কথা গল্প করিয়া বলিতেন। তাহার সামান্যই মনে আছে এবং বলিতেছি। ইহাতে সমাজের অনুন্নত অবস্থার আভাষ পাওয়া যাইবে। সেবাশ্রম স্থাপনের পর সেদিকেও উন্নতি হইয়াছে ইহাই বক্তব্য। তিনি বলিতেন যে, প্রথম প্রথম সেবাশ্রমের রোগী বেশীর ভাগই বাঙালী হইত। ক্রমে সহরের ব্রজবাসীরা আসিতে আরম্ভ করে। পরে দেহাতী দূরগ্রামের রোগীরও ভিড় জমে। এই সকল রোগীরা রোগের প্রথম অবস্থায় বড় আসিত না। ঝাড়-ফুক, জলপড়া, তেলপড়া, মালিস ও প্রলেপ ইত্যাদি অনেক কিছু করিবার পরে জটিল অবস্থা সৃষ্টি করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইত। সাগু-বার্লি তাহাদের কোন পুরুষেও খায় নাই—উহা পাকাইতেও জানিত না। বাজ্‌রে কি রোটী, গহুঁ কী ফুলকী, অরহর বা উড়্‌ৎকা ডাল ( প্রচুর হিং এর ছোঁক দেওয়া ), চাউল ( ভাত ), চনেকা শাক, ছোলাভাজা,

চাট্‌নী, দুধ, দহি, রাবড়ী, লাড্ডু, পেয়ারা—এইসব রুচিমাফিক্ অদল বদল করিয়া জ্বর, নিউমোনিয়া বা রক্ত-আমাশয়েও চলিত। এই রোগীদিগকে তাহাদের পথ্য ও 'পরহেজ' (অপথ্য) এবং ঔষধ খাওয়ার ব্যবস্থা বুঝাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। নূতন ব্রহ্মচারী কর্ম্মীদের ইহা বিশেষ সমস্যার ব্যাপার ছিল। বুঝাইবার ত্রুটি হইলে নিত্যই নূতন নূতন বিভ্রাট ঘটিত; যথা—কাগজ কাটা ৬ দাগ লাগান বোতলে ৬ ডোজ ঔষধ দিয়া বলা হয়েছে, "বোতলমে দো রোজকা দাওয়াই হ্যায়। সুবে (প্রাতে) স্যাম (সন্ধ্যায়) দুপেরকো তিন দফে তিন দাগ দাওয়াই খায় লেনা।" রোগী তৃতীয় দিনে আসিয়া বলিল, "স্বামিজী, দরদ্‌কা কুছ্ ফায়দা নাহি হুয়া।" মহারাজ ভারি চিন্তিত হইলেন, তাঁহার অব্যর্থ ঔষধ ব্যর্থ হইল! কি করা যায়? অনেক প্রশ্ন করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া নূতন ঔষধ দিতে যাইয়া বোতল চাহিলেন। রোগী পূর্ব্বের ঔষধ পূর্ণ বোতলটি বাহির করিয়া দিল। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাওয়াই নহি পিয়া?" রোগী বলিল, "দো রোজমে ছয় দাগ খায় লিয়া।" অর্থাৎ শিশির গায়ের কাগজের ছয়টি দাগ খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিয়া খাইয়াছে। অপরাধ ছয় খোরাক না বলিয়া 'ছয় দাগ দাওয়াই' বলা হইয়াছিল!

আর একদিন আর একটী রোগী দুইদিনের ছয় খোরাক ঔষধ একদিনেই নিঃশেষ করিয়া পরদিন আবার ঔষধের জন্য উপস্থিত হইয়া জানাইল যে, ছয় খোরাক ঔষধই কাল

শেষ হইয়াছে। কাল সন্ধ্যার সময় তিন জন রেস্তাদার ( কুটুম্ব ) এসেছিল। "উস্কো ছোড় কর্ ক্যাসে দাওয়াই পিযাই। তিনোকো তিন খোরাক দাওয়াই পিয়াইকর, পিছে হাম্ দাওয়াই পিয়া।" মহারাজ বলিলেন, "আচ্ছা কিয়া—ভালা আদ্‌মিকো ভি মরিচ্ ( রোগী ) বনায় দিয়া!" *

ইহা ছাড়া অনেক রোগীই তিনবার ঠিক সময়মত ঔষধ খাইত না। ভুল হইলে দুইবার বা তিনবারের ঔষধ একবারেই খাইত। থার্ম্মোমিটার ও ষ্টেটিস্কোপ লাগাবার পরেও নবজ্ ( নাড়ী ) ধরিতে হইত। নতুবা রোগীর বিশ্বাস হইত না। এইরূপে বহু বিষয়ের ত্রুটি ক্রমশঃ সংশোধন হইতে থাকে।

মহেন্দ্রনাথ বৃন্দাবনে যাইয়া নূতন মানুষ হইয়া গেলেন। পূর্ব্বের রুদ্র—শৈব ভাব আর নাই। এখন রাধা ভাব—কোমলতা ও মধুরতা সর্ব্ববিষয়ে! আহার নিরামিষ ও যৎসামান্য। মথুরা, বৃন্দাবন ও হরিদ্বার তীর্থে অবস্থান কালে তিনি কখনও আমিষ বা পেঁয়াজ রসুন প্রভৃতি ভক্ষণ করেন নাই। কালাবাবুর কুঞ্জে যত দিন ছিলেন, তত দিন তিনি মধ্যের মন্দির-প্রাঙ্গনের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বস্থ বেদীর উপর বসিয়া অধিক সময় কাটাইতেন। দ্বিপ্রহরে ও রাত্রিতে শয়ন কক্ষে বিশ্রাম করিতে যাইতেন। নিম গাছের ছায়ার তলে ঐ স্থানটী তাঁহার অতি প্রিয় সাধনার আসন ছিল।

---

* মথুরার ডাঃ শ্রীঅবিনাশ দাসের নিকটও এইরূপ অনেক গল্প শুনিয়াছি।

এখানে বসিয়া প্রতিদিন প্রাতে ও বৈকালে চা পান এবং তামাক সেবন করিতেন। হাসি ঠাট্টা তামাসা করিয়া আগন্তুক রোগী ও যাত্রী এবং কর্ম্মীদের সজীব করিয়া তুলিতেন। আবার সময় সময় একেবারে নির্ব্বাক থাকিতেন। দিনের পর দিন আপন মনে জপ করিতেন। কখনও বা যমুনার দিকে তাকাইয়া আপন মনে গান গাহিতেন—

১। রাধা বই কেউ নাই কো আমার
রাধা বলে বাজাই বাঁশী···

২। কই কৃষ্ণ এলো কৃষ্ণ বাজিল বাঁশরী
সুখে শুক-সারী মুখোমুখী করি···

৩। আমি যে অবলা নারী, যাইতে না পারি
সেকি কভু একবার আসিতে না পারে ?···

৪। কাহে সই, জিয়ত মরত কি বিধান ?···
আগে নাহি জানন্থু, রূপ হেরি ভুলন্থু,
হৃদি কৈন্থু চরণ যুগল···

* * * *

(কিবা) কানন বল্লরী গল-বেড়ি বাঁধই, নবীন তমালে দিব ফাঁস।
নহে শ্যাম শ্যাম শ্যাম, শ্যামনাম জপই, এছার তনু করিব বিনাশ ॥

কতবার যে গানগুলি তিনি বিভোর হইয়া গাহিতেন তখন, নিজস্ব মন্দ্রগম্ভীর করুণ সুরে, তাহা এখনও আমাদের কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতেছে। তখন তিনি এত সহজ ছোট ছেলে মানুষটীর মত হইয়া গিয়াছিলেন যে, সকল সময় আমরা

তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি নাই। এইজন্য পরে দুঃখ হইত। উপায়ান্তরও ছিল না।

একদিন এক কর্ম্মী ( ব্রঃসাধন ) তাঁহাকে অবজ্ঞাসূচক কিছু বলিয়া তাঁহার মনে ব্যথা দিয়াছিল। সন্ধ্যার পরে নিজ ঘরে সাধনকে ডাকিয়া আনিয়া কত মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া তাহার দ্বারা কৌশলে নিজ পায়ে হাত দেওয়াইলেন। এই কর্ম্মী পরবর্ত্তীকালে আমাকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিয়াছিল যে, "আমার অজ্ঞান জনিত অপরাধে পাছে আমার কোন অনিষ্ট হয়, সেই নিমিত্ত কালবিলম্ব না করিয়া এইভাবে আপনা হইতেই আমাকে ক্ষমা করিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন।" এরূপ ঘটনার অন্ত নাই। পরের ত্রুটী বা দোষ উপেক্ষা করা বা ক্ষমা করা এবং সকল প্রকার দুঃখ সহ্য করাই যেন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

স্বর্গীয় মহাপ্রাণ ৺হেমচন্দ্র নাগ মহেন্দ্রনাথের সেবার জন্য সর্ব্বদা অর্থ সাহায্য করিতেন। দুধ, ঘি, চা, তামাকাদির বাবদ প্রতি মাসেই টাকা পাঠাইতেন। তাঁহার জন্য দুধ, ঘি, আনা হইত ( তখন দুধ ১৬ সের টাকায়, রাবড়ির সের চারি আনা ) কিন্তু তিনি সকলকে না দিয়া নিজে কখনও কিছু গ্রহণ করিতেন না। এইজন্য আট দশ দিনের বেশী দুধ, ঘি খাইতে পারিতেন না। সেবাশ্রমের অতি সাধারণ অপুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া তিনি মহানন্দে দিন যাপন করিতেন। এইরূপে অপরের সহিত নিজের সর্ব্বত্র সাম্য ভাব বজায় রাখিতেন।

সেবাশ্রমে লোকসমাগম প্রায় সকল সময়ই লাগিয়া থাকিত। প্রাতে রোগীর ভীড় প্রায় সাতটা হইতে এগারটা পর্য্যন্ত থাকিত। বৈকালে ৪টায় স্থানীয় বাঙালী ভদ্রলোক, সাধু ও যাত্রীর দল আসিত। স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের মধ্যে লালাবাবুর স্টেটের ম্যানেজার হেমন্তবাবু, খাজাঞ্চী চক্রবর্ত্তী মহাশয়, কারিন্দার ভুজঙ্গবাবু, ঢাকার বাঙালী পাণ্ডা বিপিনবাবু, প্রেম মহাবিদ্যালয়ের নলিনীবাবু, ডাঃ শশী ব্যানার্জ্জী, চাটুজ্জ্যে মহাশয়, রাধাবাগের কালিকানন্দজী ও সোম মহাশয় প্রভৃতি সকলেই অল্পক্ষণের জন্য হইলেও একবার হাজিরা দিয়া যাইতেন। ত্যাগী বৈষ্ণব সাধুদের যে দুই একটার কথা তিনি 'ব্রজধাম দর্শন' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারাও আসিতেন। বাবুদের অনেকে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত থাকিতেন। তাঁহাদের যাওয়ার পরে আমরা রাত্রিতে ভোজন করিতাম।

সেবাশ্রমের কর্ম্মীদের বৈকালে কাজের বেশী চাপ থাকিত না। কেহ কেহ এক একদিন দু'এক ঘণ্টার জন্য বাহিরে বেড়াইতে যাইতেন। মহেন্দ্রনাথও প্রায়ই প্রাতে ও বৈকালে পায়চারি করিতে বাহির হইতেন। নির্দ্দিষ্ট কোন স্থান ছিল না। কোন দিন যমুনার উপর টিকারির ঘাট, কেশী ঘাট ও যমুনাপুলিনে; কখনও বা ব্রহ্মচারীর মন্দির হইয়া গোপেশ্বর শিব দর্শন করিয়া শেঠ ও সাহজীর মন্দির, গোবিন্দজীর মন্দির দেখিতে যাইতেন। এক একদিন রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে কিষণজীর কুটীরে যাইতেন। একাকী দূরে বড় যাইতেন না।

যখন দূরে যাইতেন তখন কর্ম্মীদের দু'একজন সঙ্গে যাইত। উল্টারথের দিন যমুনাপুলিনে মেলা হইত। তথায় আমরা সকলে মিলিয়া বৈকালের দিকে যাইতাম। পাঁপড়ভাজা প্রভৃতি কিনিয়া টীকারির ঘাটে বসিয়া আনন্দ করিয়া খাইতাম। একবার কিষণজীও আমাদের সহিত যোগদান করেন। একাদশীর দিন বৈষ্ণব সাধুকে পাঁপড় খাইতে দেখিয়া ঘাটের স্নানরত বৈষ্ণব সাধুরা তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিতেন ; তিনি উাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। তখন তিনি বিধিনিষেধের পারে—প্রেমরাজ্যে—শুচি অশুচির উর্দ্ধে বিচরণ করিতেছেন। আমাদের এই মিলন ও প্রীতিভোজন কত আনন্দময় করিয়া তুলিতেন।

দুইচার দিন দেখা না হইলে মহেন্দ্রনাথ কিষণজীর কুটীরে আমাকে লইয়া সন্ধ্যার সময় যাইতেন। মহেন্দ্রনাথ দ্বারে যাইয়া 'রাধে' 'রাধে' বলিয়া ডাকিতেন। কিষণজী সন্ধ্যার সময় আসন ত্যাগ করিয়া কোথাও বড় থাকিতেন না। আপন মনে অন্ধকার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। মহেন্দ্রনাথের ডাক শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া "আইয়ে, মহারাজ", "পায় লাগি, মহারাজ"—বলিয়া কত আদরে অভ্যর্থনা করিতেন। যেন ভগবান্ দ্বারস্থ হইয়াছেন। কোনদিন একটু মিষ্টি হাতে দিয়া কূপ হইতে জল তুলিয়া পানার্থে হাতে ঢালিয়া দিতেন। এক একদিন মিষ্টিও থাকিত না, অমনি শুধু কূপের জল তুলিয়া পান করিতে দিতেন।

মহেন্দ্রনাথ গদগদস্বরে বলিতেন, "প্রাণেশ, স্বর্গের সুধাবারি পান কর, এমন প্রেমের বস্তু আর পাবে না। তাঁহার দর্শনে আমাদের যে আনন্দ হইত তাহা ভাষায় বুঝান যায় না।

একবার ১৯১৫ সালের প্রথমে শীতের সময়ে একদিন আমরা যাইয়া দেখি কিষণজীর খুব জ্বর হইয়াছে। সামান্য এক মোটা চাদর মুড়ি দিয়া আসনের উপর পড়িয়া রহিয়াছেন। শীতবস্ত্রের নিতান্ত অভাব দেখিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ এক্কা ডাকিয়া তাঁহাকে তাহাতে তুলিয়া সেবাশ্রমে লইয়া আসি এবং তাঁহাকে আমাদের ঘরে রাখিয়া চিকিৎসা করাই। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন কিষণজীর নিউমোনিয়া হইয়াছে। সাধ্যমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল। দশ বারো দিন পরে আরোগ্য লাভ করেন। তখন তিনি নিজ কুটীরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হন। আমি জোর করিয়াও দুইদিনের বেশী তাঁহাকে রাখিতে পারি নাই। যাইবার সময় একটী তুলা ভরা জামা ও একটী কম্বল লইতে বাধ্য করি। উহা তিনি প্রেমের দান বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। এই কম্বল সম্বন্ধে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আবার বলিব।

———

## তৃতীয় স্তবক

( ঢাকা, বেঞ্জরা, নারায়ণগঞ্জ, বিক্রমপুর-পাইকপাড়া, বৃন্দাবন, মীরাট ও কুম্ভমেলায় হরিদ্বার, কনখল, মায়াবতী, বৃন্দাবন। )

১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে আমি একাই গয়া হইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসি। মহেন্দ্রনাথ অল্পদিন পরে কলিকাতা আসেন। ভক্তবর শ্রীহরেন্দ্রকুমার নাগ তাঁহার ঢাকা বেঞ্জরা গ্রামের ভবনে আমাদের উভয়কে লইয়া যান।

ঢাকার দক্ষিণে বুড়ীগঙ্গা। তাহার অপর পার হইতে এক মাইল দক্ষিণে বেঞ্জরা গ্রাম। তথায় ভক্তবর শ্রীহরেন্দ্র নাগের পৈত্রিক বাসভবন। বিগত পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৯ সালে সম্ভবতঃ বৈশাখ মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ গৃহীভক্ত মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ একবার অল্প সময়ের জন্য শ্রীহরেন্দ্র-ভবনে পদার্পণ করেন। তাঁহারই আদেশক্রমে তথায় প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারী শ্রীশ্রীঠাকুরের কল্পতরু-উৎসব মহা সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়া আসিতেছিল। এই উৎসব উপলক্ষ্য করিয়াই অল্পদিন পূর্ব্বে মহেন্দ্রনাথের এখানে আগমন হয়। নানা স্থান হইতে বহু ভক্ত উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীহরেন্দ্র-ভবনে সমবেত হন। মহেন্দ্রনাথ সমাগত ভক্তমণ্ডলীর সহিত নানা প্রসঙ্গে আলাপ করেন। তাঁহার সৌজন্য ও সুমধুর ব্যবহারে সকলেই প্রীত হন। মহেন্দ্রনাথের তখনও বৃন্দাবনের মধুর

ভাবের ঘোর কাটে নাই—দেবেন্দ্রনাথের মধুর ভাবে সিক্ত নাগ পরিবার ও ভক্তগণের নিকট মহেন্দ্রনাথের সঙ্গ বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। মহানন্দে পক্ষকালেরও অধিক তথায় কাটিয়া গেল।

ইহার পর মহেন্দ্রনাথ ঢাকা নগরীতে চলিয়া যান। তখন ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী শঙ্করানন্দ প্রভৃতি দশ বারো জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন। ঢাকায় তখন একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের আবাসস্থলে দলে দলে লোকসমাগম হইতেছিল। প্রায় প্রত্যহ সহরের নানাস্থানে ভক্তপরিবারে উৎসব, সভা সমিতিতে আলোচনা, বক্তৃতা, কীর্ত্তন ও সঙ্গীতের মজলিস ইত্যাদি হওয়ায় সহরটী তখন মাতিয়া উঠিয়াছিল। মহেন্দ্র-নাথের আগমনের পর মহারাজগণ তাঁহাকে নিজেদের কাছেই রাখিয়া দিলেন। তিনিও অনুগত কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত সঙ্গে থাকিয়া সমাগত ব্যক্তিদিগের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। নানা প্রসঙ্গে তাঁহাদের সহিত আলাপ ও আলোচনা করিতেন। একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের এক সভায় বাবুরাম মহারাজ বাংলায় বক্তৃতা করেন এবং পরে মহেন্দ্রনাথকে কিছু বলিবার জন্য আদেশ করেন। মহেন্দ্রনাথ প্রস্তুত ছিলেন না, অগত্যা দাঁড়াইয়া অল্পক্ষণ ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। তাঁহার গম্ভীর স্বর ও উচ্চারণভঙ্গী সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়া-

ছিল। আমরা যাঁহারা জ্যেষ্ঠের বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম এই বক্তৃতা শুনিয়া কনিষ্ঠের যে সে যোগ্যতাও রহিয়াছে তাহার পরিচয় পাইলাম। মহেন্দ্রনাথ তাঁহার এই শক্তির কখনও বিকাশ করেন নাই। করিলে একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা হইতেন সন্দেহ নাই।

ঢাকার প্রবাসে মহেন্দ্রনাথের মহারাজদ্বয়ের একান্ত ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া চলাফেরাকার্য্য একটী শোভনীয় দৃশ্য ছিল। নিজ ব্যক্তিত্বের কোন প্রকাশই তখন পায় নাই। মহারাজের বিনানুমতিতে কোথাও এক পা যাইতেন না। ঢাকা মিশনের ভিত্তিস্থাপন কালে সমস্ত দিনব্যাপী পূজা হোম কীর্ত্তনাদিতে উপস্থিত থাকিয়া পূর্ণভাবে যোগদান করেন।

সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠান্তে ঢাকায় দুই চারিদিন অবস্থানের পর মহারাজের অনুমতি লইয়া নারায়ণগঞ্জের ভক্তবর ৺নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে মহেন্দ্রনাথকে লইয়া আমি ও শ্রীহরেন্দ্র নাগ গমন করি। পরদিবস মহারাজগণও চৌধুরী মহাশয়ের নূতন ভবনে আগমন করেন এবং তিনদিন অবস্থান করেন। তথায় এই দিবসত্রয় বহু জনসমাগম হয় এবং উৎসবের আনন্দে কাটিয়া যায়। তথা হইতে বাবুরাম মহারাজ দুই মাইল দূরে সাধু শ্রীদুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের বাসস্থান দেও-ভোগ গ্রাম দর্শন করিতে যান এবং তৎপর দিবস মহারাজগণ সকলেই কলিকাতায় রওনা হন।

তাঁহাদের যাইবার পূর্ব্বে গ্রামবাসিগণের বিশেষ আগ্রহ

দেখিয়া মহারাজ মহেন্দ্রনাথকে বিক্রমপুর-পাইকপাড়া গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুরের এক উৎসবে যোগদান করিতে অনুমতি দেন। পর দিবস আমরা তাঁহাকে লইয়া ষ্টীমারযোগে বিক্রমপুর-পাইকপাড়া যাই। পথে তাঁহার ভেদ ও বমি হয়। একদিন বিশ্রামের পর সুস্থ হন। তাঁহাকে পথ্য করিতে অন্নের সহিত বেতের নরম অগ্রভাগটী ভাতে সিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তাহা তিনি বিশেষ রুচিপূর্ব্বক আহার করেন। প্রত্যহই 'বেত ভাতে' খাইতে চাহিতেন। সমাগত লোক "কেমন আছেন" জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কখনও বলিতেন, "আমি আপনাদের দেশে আসিয়া বেত খাইয়া ভাল হইয়াছি।" অথবা, "ভাল হইয়াও বেত খাইতেছি।" তিনি যে কয়দিন বিক্রমপুর-পাইকপাড়া গ্রামে ছিলেন। সর্ব্বক্ষণই তাঁহার নিকট লোকসমাগম দেখা যাইত। স্কুলের ছাত্র, মাষ্টার ও জমিদার ৺কৈলাস মিত্র মহাশয় প্রভৃতি গ্রামের বিশিষ্ট ভদ্র-লোকগণ মহেন্দ্রনাথকে ঘিরিয়া কত রকম প্রশ্ন করিতেন, তিনি সহাস্যে তাঁহাদের সকল প্রকার প্রশ্নেরই সদুত্তর দানে তুষ্ট করিতেন। মহেন্দ্রনাথের কথা বহুদিন পরেও গ্রামে তাহাদের মধ্যে আলোচিত হইত।

ঢাকা হইতে ভক্তপ্রবর স্বর্গীয় ৺হরপ্রসন্ন মজুমদার ও তাঁহার পুত্র সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীমান্ নীরদরঞ্জন, বারদী হইতে হেড্‌মাষ্টার শ্রীরাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং আরও নানা স্থানের ভক্তগণ আসিয়া মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে অবস্থান করিয়া-

ছিলেন। অল্পদিন পরে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়। তাহাতে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের সকল সম্প্রদায়ের ও সকল শ্রেণীর লোক গ্রাম্য দলাদলি ভুলিয়া একত্র মিলিত হয় এবং বিরাট উৎসবটী সুসম্পন্ন করে। উৎসবে শিক্ষক ও ছাত্রগণের বিশেষ উৎসাহ দেখিয়া মহেন্দ্রনাথ অতিশয় আহ্লাদিত হন এবং তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগ্রত রাখিবার নিমিত্ত প্রত্যহ মিলিত হইবার জন্য একটী মিলনের স্থান করিতে বলেন। তথা হইতে দীন দরিদ্রের সেবাকার্য্যের দ্বারা স্বামিজীর আদর্শ "আত্মনো মোক্ষায়, জগদ্ধিতায় চ"—আপন মোক্ষ ও জগতের হিতসাধনের উপদেশ দেন। মহেন্দ্রনাথের এই শুভাগমনের ফলে যুবকগণের মধ্যে এক জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হয়। পরহিত-সাধন ব্রত লইয়া প্রথমে কতিপয় যুবক সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হয়। তদবধি তথায় বর্ত্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ভিত্তি স্থাপিত হইয়া সেবাকার্য্য চলিতে থাকে।

উৎসবের চার কি পাঁচদিন পরে আমরা উভয়ে একসঙ্গে কলিকাতায় চলিয়া আসি। তথা হইতে মাঘ মাসের মাঝামাঝি আমরা উভয়ে দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে চলিয়া যাই। সেখানে তখন বৈষ্ণবদিগের অর্দ্ধ কুম্ভমেলা বসিয়াছে। কিষণজীর এই সময়ই নিউমোনিয়া জ্বর হয়। বৃন্দাবনে মাসাধিক কাল অবস্থানের পর আমরা চৈত্র মাসের প্রথমভাগে মীরাটে গমন করি এবং এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে দিন কুড়ি অবস্থান করি। তখন হেড্ মাষ্টার শ্রীরাজেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী ও আমরা এক বাড়ীতেই ছিলাম।

স্বর্গীয় ৺শীতল চট্টোপাধ্যায়, ৺গণেশ চন্দ্র দে, ৺প্রতাপ্ চন্দ্র বরাট, ৺সতীশ পাল ও শ্রীকালাচাঁদ প্রভৃতি মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের কতিপয় শিষ্য ও ভক্ত তথায় তখন বাস করিতেন। তাঁহারা মহেন্দ্রনাথের নিকট নিত্য আগমন করিতেন এবং ধর্ম্মপ্রসঙ্গে আলাপ করিতেন। আমাদের মীরাটের দিনগুলি বেশ আনন্দে কাটিয়াছিল।

পরে চৈত্র মাসের শেষভাগে পূর্ণ কুম্ভমেলা দর্শন করিবার নিমিত্ত আমরা কনখলে গমন করি এবং রামকৃষ্ণ-মিশন সেবাশ্রমে যাইয়া উঠি। হরিদ্বারে তখন সর্ব্বত্র মহা ভীড় লাগিয়া গিয়াছে। গঙ্গার দুই পার্শ্বে লম্বা দুই মাইল পর্য্যন্ত নানা সম্প্রদায়ের সাধুদিগের তাম্বু, চালা, ছাউনী ইত্যাদিতে সাধুর আসন পড়িয়াছে। বড় ছোট আখড়াগুলি সাধু ও যাত্রীতে গম্‌গম্ করিতেছে। সাহারানপুর হইতে দেরাদুন-মুশৌরী পর্য্যন্ত সমস্ত খালি বাড়ী ধনী যাত্রী দ্বারা পরিপূর্ণ। ঘণ্টায় ঘণ্টায় যাত্রীপূর্ণ ট্রেণ আসিয়া জনতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। সেবাশ্রমে তিল ধারণের স্থান ছিল না; সেবক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ যাত্রীতে সর্ব্বক্ষণ পরিপূর্ণ। নিত্য নূতন রোগী রাখিবার ও যাত্রী থাকিবার জন্য অস্থায়ী চালা প্রস্তুত হইয়াছে। ৫।৬টী তাঁবুও খাটান হইয়াছে। আউটডোরে ঔষধ দিবার জন্য দুইস্থানে ঘর উঠিয়াছে। রোগীর যেমন আমদানী তেমনি সেবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কর্ম্মীদের কাহারও মুহূর্ত্ত বিশ্রামের সময় নাই। আগন্তুক দর্শক যুবক

ও ডাক্তার অনেকে সেবাকার্য্যে সাহায্য করিতেছিলেন। চতুর্দ্দিকে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। ভোজনের সময় শতাধিক লোকের পাতা পড়িত। এমন সময় আমরা সেবাশ্রমে যাইয়া উঠি। অধ্যক্ষ শ্রীমৎ কল্যাণ স্বামী ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দজী আমাদের বিশেষ যত্নের সহিত পৃথক থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। পরে ৺রাজা রাও আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হন। রাস্তায় বাহির হইলেই পূর্ব্ব পরিচিত বহু লোকের সহিত দেখা হইত। আমরা প্রাতে ও বৈকালে গঙ্গার দুই ধারে নানা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহী যাত্রী দর্শন করিয়া বেড়াইতাম। কাবুল, কান্দাহার, মান্দালয়, সিন্ধু, মণিপুর, কন্যাকুমারী ও লঙ্কাদ্বীপ প্রভৃতি দূর দূর দেশের নানা বেশধারী হিন্দু যাত্রী সমাগম দর্শন করিয়া গৌরব অনুভব করিতাম। হঠ-যোগী সাধুদের নানারূপ আসন ও অগ্নিকুণ্ডের উপর অধঃশিরে দোলন, অগ্নি বেষ্টিত কণ্টকাসনে উপবিষ্ট কত সাধু দেখিতাম। নানাস্থানে বক্তৃতা, পাঠ ও ব্যাখ্যা, ভজন গান ও কীর্ত্তনাদিতে মর্ত্ত্যে এক নব জাগরণ আনিয়াছিল। এই সমুদয় নিত্য দেখিয়া কাহারও যেন আশ মিটিতেছিল না।

সাধুদিগের সেবার জন্য স্থানে স্থানে অন্নসত্র খোলা হইয়াছিল। বহু ধনী ব্যবসায়ী রাজা মহারাজা ও রাণীগণ-কর্ত্তৃক এই সমুদয় পারিচালিত হইত। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল। সাধুদিগের কোন বিষয়ের

অভাব ছিল না, গৃহস্থেরও নহে। এইভাবে কুম্ভমেলা জমিয়া উঠিল। অবশেষে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে প্রাতঃকালে স্নানের জন্য সাধুগণের মিছিল বাহির হইল। আমরা দুইজনে প্রত্যুষে গঙ্গার ধারে মেলা দর্শন করিতে বহির্গত হইলাম। পশ্চিম পাড়ে অর্থাৎ ব্রহ্মকুণ্ডে যাইবার মায়াপুরের পথে জনতার জন্য অগ্রসর হইতে পারিলাম না। এই মেলা উপলক্ষে গঙ্গার উপরে এপার ওপার যাইতে যে দুইটি অস্থায়ী সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, তাহার প্রথমটী দিয়া গঙ্গা পার হইয়া, যেখানে ভীড় কম সেখানে যাইয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে বেলা নয়টা কি সাড়ে নয়টাতে আমাদের সম্মুখ দিয়া সাধুগণের মিছিল বাহির হইল। প্রথমে শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত দশনামা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ আপন আপন মর্য্যাদা ও ঐশ্বর্য্যানুরূপ হাতী বা পাল্কীতে করিয়া চলিয়া-ছেন, তৎপশ্চাতে শত শত উলঙ্গ নাগা সন্ন্যাসী পদব্রজে চলিলেন। তাহার পরে বৈষ্ণব সাধুর দল বড় ঠাঁটের সহিত গেলেন। ইহাদের পরে গৌড়ীয় বৈরাগীর দল দেখা গেল এবং সর্ব্ব পশ্চাতে গৃহস্থগণের উন্মত্ত জনতা চলিতে লাগিল। এইভাবে দীর্ঘ তিন ঘণ্টার কম নহে, ইঁহারা ধীরে ধীরে পথ চলিয়া অপর পারে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানার্থে গমন করিলেন। আমরা আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। এই স্থান হইতে ব্রহ্মকুণ্ডের বিপুল জনতা দর্শন করিলাম এবং গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া সেবাশ্রমে ফিরিলাম।

এখানে একটী ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাদের বৃন্দাবনের বন্ধুবর সেই কিষণজীও কুম্ভমেলায় আসিয়া গঙ্গাতীরে একটি আসন লইয়াছিলেন। প্রত্যহ সেবাশ্রমে যাইয়া আমাদের দর্শন দিতেন। আমরাও তাঁহার আসনে কখনও কখনও যাইতাম। কুম্ভস্নানের দিন তাঁহাকে হাতীর উপর রূপার হাওদায় বসিয়া বৈষ্ণব সাধুদের সর্ব্বপ্রথমে যাইতে দেখিয়া আমরা উভয়ে অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি আমাদিগকে নীচে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াই ডাকিয়া বলিলেন, "বাবুজী, আপ্‌কা কম্বল মেরা শির পর"—এই বলিতে বলিতে হাতীসহ চলিয়া গেলেন। মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "শোন, শোন, কিষণজী কি বলিতেছেন, আমরা নীচে পথে দাঁড়াইয়া আর তিনি হাতীর উপর বসিয়া ; প্রেমের রাজ্যে এই ব্যবধানটুকু সহ্য হইল না। তাই তোমাকে বলিলেন তোমার বৃন্দাবনে দেওয়া সেই পুরাতন কম্বলটী তাঁহার সঙ্গে—মাথায়।" প্রেমিকের এই ব্যবহার চিরদিনের তরে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেল! পরদিন কিষণজী কৈফিয়ৎ দিতে আসিলেন। বলিলেন, তাঁহার গুরুদেব প্রাচীন ও বৈষ্ণব সাধুদের সর্ব্বাগ্রণী। হঠাৎ তিনি পূর্ব্ব রাত্রে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং স্নানে যাইতে অক্ষম হন। তখন তিনি কিষণজীকে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শিষ্য হিসাবে গুরুস্থানে বসিবার আদেশ দেন। গুরুর আদেশে তিনি গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঐভাবে সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করেন।

কুম্ভ মেলার অল্পদিন পরে আমরা মায়াবতীর অদ্বৈত-আশ্রম দেখিতে রওনা হই। পরদিবস সরযূর তীরে টনকপুরে স্নেহময়ী এক বৃদ্ধা পাহাড়ী রমণীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া রাত্রি বাস করি। এর পরদিন দ্বিপ্রহরে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের পাহাড়ী হাঁটা পথে শুকীডাংএর দিকে চলিতে আরম্ভ করিলাম। জনশূন্য অরণ্য পথে আমরা দুটী প্রাণী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। একদিকে উচ্চ পাহাড়ের গায়ে অরণ্য, অপর দিকে অনেক নীচ পর্য্যন্ত জঙ্গল। তথা হইতে মাঝে মাঝে জন্তু জানোয়ারের শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমার জীবনে এরূপ পথে ভ্রমণ এই প্রথম। মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে দেখিয়া মহেন্দ্রনাথ গান ধরিলেন—

"নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপ রাশি
তাই যোগী ধরে ধ্যান হয়ে গিরি-গুহাবাসী॥" ইত্যাদি

* * *

এইরূপে ঘণ্টাখানেক চলিবার পর মহিষের গলঘণ্টার শব্দ শুনিতে পাইলাম এবং পথে মূত্রের চিহ্ন দেখিয়া ধড়ে যেন প্রাণ আসিল। সন্ধ্যার সময় শুকীডাং ডাকবাংলায় আসিলাম এবং তথায় না থাকিয়া একটী লোক সঙ্গে লইয়া এক ঘণ্টা নির্জ্জন অন্ধকার পথ হাঁটিয়া স্বামী বিরজানন্দজীর শ্যামলাতালের নূতন আশ্রমে যাইয়া উপনীত হইলাম। স্বামিজী আমাদিগকে হঠাৎ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন, "তোমরা এই বাঘ ভাল্লুকের পথে কি করিয়া

নিরাপদে আসিলে ?" তখনও তাঁহার আশ্রম তৈয়ারী হইতে অনেক বাকী ছিল। একটী মাত্র দোতলা ঘর প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাতে দরজা জানালা তখনও লাগান হয় নাই। স্বামিজী একটী খড়ের ঘরে খড় বিছানো মেঝের উপর কম্বল বিছাইয়া পুস্তকাদি লইয়া রাত্রি যাপন করিতেন। আমরাও তাঁহার পার্শ্বে মেঝের উপর শয্যা বিস্তার করিলাম। রাত্রে ডাল-রুটি ও আলু-পেঁয়াজের তরকারী খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রিতে ঘরের বাহিরে যাওয়া বিপদ্ জনক বলিয়া ঘরেই প্রস্রাব করিতে হইত। বিরজানন্দস্বামী স্বামিজীর জীবন চরিতের প্রুফ রাত্রি জাগিয়া দেখিতেছিলেন। আমরা পরদিন তথায় থাকিয়া মনোরম দৃশ্য সকল ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। আশ্রমের পাহাড়টীর নীচ দিয়া সরযূনদী ক্রমশঃ বিস্তৃতাকারে সমভূমি টনকপুরের দিকে কলকল শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। অপর একদিকে পাহাড়ের মধ্যে একটী বড় 'তাল' বা সরোবর রহিয়াছে। তাহার নাম 'শ্যামলাতাল'। ঐ স্থান খুব নির্জ্জন ও হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ। এই সমস্ত সারাদিন দেখিলাম, পরদিন আহারের পর মায়াবতীর দিকে রওনা হইলাম।

কুলী আগেই বিছানার গাঁটরী লইয়া চলিয়া গেল। আমরা শুকীডাং হইয়া দেওরীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথ ১৭ মাইলের উপর। আমরা সমভূমির লোক, পার্ব্বত্যপথে চড়াই উৎরাই করিতে অনভ্যস্ত ; চলিতে বড়ই কষ্ট হইতেছিল। পূর্ব্বের ন্যায় এপথেও আমরা দুইজন একাকী চলিয়াছি। ক্বচিৎ

পাহাড়ী লোকের সহিত দেখা হইত। চারিদিকের বিচিত্র দৃশ্য সকল কষ্ট অনুভব করিতে দেয় নাই। উপরে মেঘমুক্ত দিগন্তব্যাপী নীল আকাশ, নীচে দূরে চারিদিকে পর্ব্বতমালার সারি, ধ্যানী পুরুষের মত বসিয়া আছে। নিকটে বড় বড় চীর গাছের বন; তলার মাটীর উপর কি পরিষ্কার! গালিচা পাতিয়া যেন আমাদিগকে বিশ্রামের জন্য ডাকিতেছিল। মুকুটের মত দেবদারু শ্রেণী বিস্তীর্ণ মাল ভূমির উপর দীর্ঘ সারি ক্রমে নামিয়া এক অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল। বিচিত্র বর্ণের লতাপাতা ফুল ফল প্রস্তরখণ্ড ও মাটী কুড়াইতে কুড়াইতে বোঝা হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে উহা ঝরণার ধারে ফেলিয়া দিয়া জলপান করিতাম। এইভাবে রূপের মাদকতার ঘোরে চলিতে চলিতে আমরা সরযূর তীরে আসিয়া অবতরণ করিলাম ও তথাকার মনোরম শোভা দেখিয়া চমকিত হইলাম। উপরে নীল আকাশের নীচে রক্তবর্ণ দুই খাড়া পাহাড়, তাহার মধ্য দিয়া প্রস্তরখণ্ডে হর হর বম্ বম্ ধ্বনি করিতে করিতে বিপরীত দিকের লাল পাহাড়টী বেষ্টন করিয়া সরযূনদী যেন সীতাদেবীর ন্যায় অগ্নিশিখা মধ্যে গলিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

আমরা নদীগর্ভে এক বিরাট প্রস্তর খণ্ডের উপর যাইয়া বসিয়া পড়িলাম ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। পরে কিঞ্চিৎ জলযোগ সমাপন করিয়া হর হর বম্ বম্ বলিতে বলিতে চড়াই শুরু করিলাম। বামদিকে সরযূর সুদীর্ঘ বিস্তীর্ণ ধারা দেখিতে দেখিতে উঠিতে লাগিলাম। শুনিলাম এই পাহাড়ের উৎরাইতেই

দেওরী-বাজার ও ডাকবাংলা মিলিবে এবং তথায় আজ রাত্রিতে বিশ্রাম করিতে হইবে। উৎসাহের সহিত উৎরাই আরম্ভ করিলাম। খানিক দূর যাইয়া পাহাড়ী মেয়েদের কণ্ঠগীত কর্ণ গোচর হইল। একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম শস্য কাটা শেষ করিয়া মোট মাথায় দিবাবসানে মেয়েরা ঘরে ফিরিতেছে। তাহাদের সঙ্গে এক অপ্রশস্ত নদী পার হইয়া গ্রামে পৌঁছিলাম। শুনিলাম ইহাই আমাদের বিশ্রামস্থান দেওরী। ডাকবাংলায় গাঁটরী পাইলাম। বিছানা খুলিয়াই তাহাতে শুইয়া পড়িলাম। কিছু করিবার সামর্থ্য ছিল না। প্রয়োজনও আর রহিল না।

হর হর ধ্বনি শুনিয়া পার্ব্বতী দেবীর দয়া হইয়াছে। সুবেদারণী সরস্বতী দেবী আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি কুম্ভ মেলার ফেরৎ দেশে যাইবার পথে দেওরী আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন ও আমাদের কথা কুলীর নিকট শুনিতে পান। আমরা আসিলে আমাদের ভোজনের পৃথক ব্যবস্থা করিতে হইবে না বলিয়া সংবাদ পাঠান। সর্ব্বপ্রথমে গরমজল ও চা আসিল এবং তৎপরে ডাল, রুটি, ভাজি আসিল। আমরা পার্ব্বতী দেবীর দান বলিয়া গ্রহণ করিলাম এবং রাত্রিতে সুখে অচেতন হইয়া নিদ্রা গেলাম।

সরস্বতী দেবী এক সুবেদারের বিধবা পত্নী। দেশ পৃথরাগড়— মায়াবতী হইতে দুইদিনের পথ। তাঁহারা ক্ষত্রিয় গুর্খা সৈনিকের বংশধর। স্বামী যুদ্ধে হত হন। শুনিলাম তাঁহাদের বংশে পুরুষ

বাড়ীতে কেহ বড় মারা যায় নাই। তখনও তাঁহার দুই পুত্র জার্ম্মান যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল। একজন সম্প্রতি শত্রু হস্তে বন্দী হইয়াছেন। ইহাতে বীর রমণীর নির্ব্বিকার চিত্তে প্রফুল্লতার কোন হানি ঘটে নাই। বরং গর্ব্বই অনুভব করিতেন। তিনি বিদুষী ছিলেন, সংস্কৃত জানিতেন, নিত্য গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। তিনি স্বামী বিরজানন্দের শিষ্যা, মায়াবতী আশ্রমে তাঁহার খুব যাতায়াত ছিল। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। স্বামিজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথকে দেখিয়া তাঁহার খুব আনন্দ হইল এবং শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে সেবা-যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ষোল বৎসরের কনিষ্ঠ পুত্র সুন্দর সিং এবং তাঁহারই বড় কনিষ্ঠা কন্যা ও প্রতিবেশীর এক বয়স্থা কন্যা—এই তিনজন আসিয়াছিল। দেওরী হইতে মায়াবতী প্রায় দেড় দিনের পথ। আমাদিগকে পরম যত্নের সহিত সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। সরস্বতী দেবীর সঙ্গে কত রকমের চাটনী, পাটালী এবং পেস্তা, বাদাম ও কিস্‌মিস্‌ দ্বারা তৈয়ারী মিষ্টান্ন ছিল। আমাদের পথে যাইতে যাইতে ঝরণাতে জলপানের সময় তাঁহার সঙ্গের ডাণ্ডিস্থ কৌটা হইতে তাহা বাহির করিয়া দিতেন। হিমালয়ের পথে ভ্রমণকালে এইরূপ শুভযোগ অতিশয় সুকৃতির ফলেই ঘটিয়া থাকে। আমরা এরূপ মাতৃস্নেহ ও ভাই-ভগিনীর আদর পাইয়া হিমালয়ই আমাদের স্বর্গ নিবাস মনে করিতে লাগিলাম।

পরের দিন বেলা দশটার মধ্যে আহারাদি সমাপন করিয়া রওনা হইলাম। সন্ধ্যার সময় চম্পাবতী আসিয়া মন্দিরের ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। চম্পাবতী দেবীর মন্দির প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে অতিথিশালা আছে, অদূরে একটী জলধারাও আছে, উপরের দিকে নিকটে একটী বাজার, তহশিল কাছারী, থানা, কাঠের গোলা ও কারবার রহিয়াছে। অপরদিকে বিস্তীর্ণ জলাভূমি। মন্দির প্রাঙ্গনে একটী মনোজ্ঞ দৃশ্য আমাদিগকে চমৎকৃত করিল; এক বিরাট গোলাপ গাছের লতা— মার্শাল নীল, ২০।২৫ হাত লম্বা একটি চীর বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া দণ্ডায়মান্। তাহাতে শত শত হল্‌দে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, সৌরভে চারিদিক আমোদিত। উহার নিকটে আশে পাশে সাধু, সাধক ও মোহন্তদিগের সমাধি ও ভজন কুটীর সকল ছিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া এই সমুদয় স্থান ঘুরিয়া বেড়াইয়া দেখিলাম এবং ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিয়া দেখি আহার প্রস্তুত। আহারাদি সমাপণ করিয়া ১১টার সময় মায়াবতী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এপথে বেশী চড়াই-উৎরাই নাই। সমভূমিতে দিগন্তব্যাপী মুকুটের মত দেবদারু-শ্রেণীর শোভা ছাড়িয়া যাইতে মন চাহিল না। এই পথ আমরা খুব ধীরে ধীরে মা ও ভাইবোনদের সহিত গল্প করিতে করিতে অগ্রসর হইলাম। অপরাহ্ণে অদ্বৈতাশ্রমে যাইয়া উপনীত হইলাম। অধ্যক্ষ স্বামী প্রজ্ঞানন্দজী মহেন্দ্রনাথকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আমাদের আশ্রমের এক ঘরে

স্থান হইল। সরস্বতী দেবীর স্থান নীচে অতিথিশালায় হইল। তিনি তথায় সাত আট দিন অবস্থানের পর দেশে চলিয়া গেলেন। আমাদিগকে যাইয়া রোজ তাঁহাকে একবার দেখা দিতে হইত। তিনি যাইবার সময় তাঁহার দেশে যাইতে বার বার বলিয়াছিলেন।

আমরা যখন মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে যাই, তখন সেখানে দুইটী পাহাড়ী টিলার উপর ৭৷৮খানি ঘর দেখিয়াছিলাম। উপরের পাহাড়ের সকলের উচ্চস্থানে সমভূমির উপর এক বাংলা—তাহাতে কাগজের গুদাম ও ছাপাখানা ছিল। তখন স্বামিজীর গ্রন্থাবলী ছাপা হইতেছিল। তাহার একটু নীচে বড় সমতল জমির উপরে বড় এক দোতলা বাংলা। উপরের হল ঘরে লাইব্রেরী ও নীচের হল ঘরে খাইবার ও বসিবার স্থান। ইহারই আশপাশে উপরে ও নীচে বাথরুম ও কর্ম্মীদের শয়ন কক্ষ সকল। ইহার পরে খেলার জন্য ঘেরা ছোট মাঠ আছে। তাহার পরেই চা প্রস্তুতের কারখানা। পিছনে একটু নীচে রোগীদের দাওয়াইখানা—দোতলা ঘর, তার উপরে ডাক্তারের বাসা। উত্তর দিকে নীচের পাহাড়ে যাইবার পথের পার্শ্বে উৎকৃষ্ট জলের ঝরণা। এই পথে আর একটু অগ্রসর হইলেই গেষ্টহাউস বা অতিথিশালা। ইহা দোতলা বাড়ী, দুইটি পরিবার থাকিবার মত সুসজ্জিত এবং নিকটে আরও একতালা ৫৷৬টী ঘর রহিয়াছে; তাহাতে সর্ব্বদাই সাধারণ অতিথিরা বাস করিত। দোতলায় ডাঃ জগদীশ চন্দ্র বসু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতিরা যাইয়া গ্রীষ্মকালে বাস করিয়াছিলেন।

অতিথিশালার পরে নীচে গোশালা—তাহাতে তখন দশ-পনেরটী গরু-ছাগল ছিল, একটী ঘোড়া ও দুইটী কুকুরও ছিল। এই সমুদয়ের পরে উত্তর প্রান্তে মাদার সেভিয়ারের বাংলা। ইহাও উত্তমরূপে সজ্জিত। এই বাংলার বারাণ্ডা হইতে বৃষ্টির পরক্ষণে নন্দাদেবীর চির-তুষার-ধবল গিরিশৃঙ্গ স্পষ্ট দৃষ্ট হইত। মাদারের বাংলার পাশ দিয়া লোহাঘাটের পোষ্ট অফিস ও বাজারে যাইবার রাস্তা। এই রাস্তা পৃথরাগড় হইয়া মানস সরোবরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। আশ্রমের পাহাড়ের অপর দিকে প্রায় এক মাইল ব্যাপী 'চা' বাগান।

মাদারের বাংলার অনেক নীচে সরয্‌ নদীর এক ক্ষীণ ধারা বহিয়া গিয়াছে। উহা সামান্য বৃষ্টির পরে কুল কুল ধ্বনিতে স্থানের চির নিস্তব্ধতার মধ্যে এক সঙ্গীত লহরীর সৃষ্টি করিত। মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গশোভা রচনা করিয়া মাদার সেভিয়ার তথায় বাস করিতেছিলেন। মাদার একদিন মহেন্দ্রনাথকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। আমাকে এবং শৈলেন্দ্রকেও বলিলেন। (শিল্পাচার্য্য শৈলেন ভায়া কিছুদিন পরে তথায় যাইয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হন।) নিজ হাতে মাদার পরিবেশন করিলেন। পরিবেশন কালে স্বামিজীর যে কত কথা শুনাইলেন—স্বামিজী এইটী খাইতে ভালবাসিতেন, ওটী এমন করিয়া তৈয়ার করিতে বলিতেন ; এই কথা বলিয়াছিলেন,অমুককে ঠাট্টা করিয়া কবিতার ছন্দে কথা বলিয়া কত হাসাইয়াছিলেন—ইত্যাদি ভোজনকালে স্বামিজীর কথা বলিতেছিলেন। স্বামিজীর কথা বলিতে বলিতে

তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইতে লাগিল। সর্ব্বক্ষণই ভক্তি রসে সিক্ত! আর একদিন বৈকালে চা পানের নিমন্ত্রণও আমাদিগকে করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার দেশের ও শৈশবের গল্প করিয়া ছিলেন।

মাদার সেভিয়ার গুরুগত প্রাণ। গুরুর আদেশে তিনি সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া পার্ব্বত্য অধিবাসীদিগের নানাভাবে অভাব মোচন করিতেছিলেন। ঐ অঞ্চলে সকলে তাঁহাকে পার্ব্বতী দেবী বলিয়া ভক্তি করিত। পাহাড়ীদের লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা, কর্ম্ম করিয়া দেওয়া, কল কিনিয়া সেলাই শিখাইয়া দরজীর দোকান করিয়া দেওয়া, রোগীকে ঔষধ পথ্য দেওয়া ইত্যাদি কত কাজে সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত রহিয়াছেন দেখিতাম। তাঁহার নিজের পরিধানে শতচ্ছিন্ন জামা ও মোজা—তাঁহার মন কোথায় রহিয়াছে তাহার আভাষ জানাইয়া দিত।

আমরা এই স্থানের শোভা, নিস্তব্ধতা ও পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে বিশ্বসংসার ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এমন স্থান ছাড়িয়া আসিবার ইচ্ছা কাহারও মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু আমাদের যাওয়ার পনের দিন পরে মাদার স্বদেশে চলিয়া যান। বিরাজনন্দ স্বামী তিন দিন পূর্ব্বে শ্যামলাতাল হইতে আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। মাদারের বিদায়ের দিন যে মর্ম্মান্তিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম তাহা আজও আমরা ভুলিতে পারিলাম না। প্রাতঃকাল হইতেই পশুশালায় পশুগুলি দাঁড়াইয়া আছে, খাইবার প্রবৃত্তি নাই; নয়ন যুগল বহিয়া বারিধারা ঝরিতেছে! পাহাড়ীরা আসিয়া শোক-মলিন মুখে নির্ব্বাক্ হইয়া রাস্তায়

রাস্তায় ঘুরিতেছে; ভৃত্যগণ কাঁদিতেছে; মেথর মেথরাণী মাটীতে লুটিয়া হাউ হাউ করিতেছে। এই শোকময় দৃশ্য পূর্ণ করিল দুইটী কাক! বৈকালে মাদার নিজ বাংলা ছাড়িয়া আশ্রমে আসিবার সময় দুইটী কাক 'কা' 'কা' শব্দে এ পাহাড় হইতে ও পাহাড়ে উড়িয়া এবং মধ্য স্থলের গহ্বর প্রতিধ্বনিত করিয়া সকলের হৃদয় কম্পিত করিয়া তুলিল। মাদারের নীল নয়ন দুইটী জলে ছল ছল করিতেছিল। মুখে বিদায় কালীন বাক্যস্ফুর্ত্তি হইতেছিল না। নীরবে তাঁহাকে বিদায় দিয়া আমরা যে যাহার ঘরে চলিয়া গেলাম।*

পরদিন প্রাতে মহেন্দ্রনাথ চা পানের সময় বলিলেন—"এখানে আর থাকা চলিবে না! চল এখান হইতে বৃন্দাবনে চলিয়া যাই।" আমাদেরও সেই মত। সঙ্গে সঙ্গে বিদায়ের আয়োজন হইতে লাগিল। পাঁচ দিন পরে কুড়ি দিন অবস্থানের পর আমরা শৈলেন ভায়া সহ তিনজনে পূর্ব্ব পথেই নামিয়া আসিলাম। এবং পুনরায় বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে সেবাশ্রমে যাইয়া উঠিলাম। অল্পদিন পরে শৈলেন ভায়া তথা হইতে প্রয়াগে নিজ বাটীতে চলিয়া যান।

---

*মাদার সেভিয়ার বিলাত যাইয়া কিছুকাল জীবিত ছিলেন। অতি বৃদ্ধা হইয়া তিনি দেহত্যাগ করেন। স্বামী বিরজানন্দজীর নিকট তাঁহার সংবাদ পাইতাম। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি শেষের দিকে মাদারের শ্রবণ, দৃষ্টি ও স্মৃতিশক্তি প্রায় লোপ পাইয়াছিল। ছিল মাত্র গুরুর স্মৃতি! সর্ব্বক্ষণ "সোয়ামিজী" "সোয়ামিজী" বলিতেন এবং গুরুর নাম করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

## চতুর্থ স্তবক

( বৃন্দাবন-মথুরা, কিষণজী ও ব্রজমণ্ডল ভ্রমণ )

এবার বৃন্দাবনে আসিয়া ছয় ঋতু কাটাইয়া ছিলাম; সেবাশ্রমের কাজ তখন পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছিল। ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথ বা নাহু মহারাজ, ব্রহ্মচারী চিন্তাহরণ, সেবানন্দজী ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকুমার (কৃষ্ণানন্দ স্বামী) ব্রহ্মচারী সাধন প্রভৃতি দক্ষ কর্ম্মিগণ তখন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ক্রমে রোগীর সংখ্যা এত বাড়িয়া গেল যে বড় স্থানের প্রয়োজন হইল। প্রচুর অর্থাগমও হইতেছিল এবং এক বৎসরকাল মধ্যেই পাণিঘাটে যমুনার উপরে ৩২ বিঘা জমি খরিদ করা হইল। আট বিঘা যমুনার গর্ভে ছিল, বাকী ২৪ বিঘার উপর গৃহাদি নির্ম্মাণের সঙ্কল্প হইল। পরে এক শুভদিনে আষাঢ় মাসে ভিত্তি স্থাপিত হইল। আমি সেবাশ্রমের পূজক ছিলাম, এই কার্য্যের ভার আমার উপর পড়িল। আমি প্রভাতে পূজাদি কার্য্য সমাপন করিয়া শ্রীচণ্ডী পাঠ আরম্ভ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বারিবর্ষণ হইতে লাগিল, দেড় ঘণ্টা ধরিয়া মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িল। আমি আসন ত্যাগ করিলাম না, পাঠ চলিতে লাগিল। মহেন্দ্রনাথ আমার মাথার উপর এক ছাতি ধরিয়া আর এক ছাতি নিজ মাথায় দিয়া জলের উপর বসিয়া রহিলেন। আমার আসনস্থ নিম্ন অঙ্গ জলে ডুবিয়া গেল। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পাঠ শেষ হইল।

এই বৎসরে এই প্রথম বারি-পাত। এতদিন বৃষ্টি না হওয়াতে দেশে হাহাকার উঠিয়াছিল। প্রবল বারিপাতে সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। আমাদেরও তাই। এই উপলক্ষে ছোটখাট একটী উৎসব হইল। তাহা নিকটস্থ রাধাবাগে শ্রীমৎকেশবানন্দজীর আশ্রমে সম্পন্ন হইল। নূতন আশ্রম প্রস্তুত হইতে বৎসরাধিক কাল লাগিয়াছিল। নাহু মহারাজ উৎসবান্তে উৎসাহের সহিত তাহাতে মনোনিবেশ করিলেন।

মহেন্দ্রনাথ পূর্ব্ববৎ তাঁহার নিমগাছের ছায়ায় বেদীর আসনে স্থান লইলেন। এবারে তিনি মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণু-পুরাণ ও ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। একান্ত মনে তাহাতেই ডুবিয়া থাকিতেন, কোথাও বড় যাইতেন না। কদাচিৎ মথুরায় তিনি অল্প দিনের জন্য যাইতেন। আমাদের সেবাশ্রমের হিতৈষী ও পরিদর্শক ডাক্তার বন্ধুবর শ্রীঅবিনাশ দাস তখন মথুরার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। * মথুরায় তাঁহারই বাড়ীতে আমাদের বাসের জন্য অবারিত দ্বার ছিল। প্রায়ই মথুরা যাইয়া দুই চার দিন তাঁহার নিকট থাকিয়া আসিতাম। মহেন্দ্রনাথ ও আমি বৈকালে মথুরার নানাস্থানে বেড়াইতাম, যমুনার বাঁকে কংসের টিলার উপর যাইয়া বসিতাম। বর্ষাকালে যমুনার বিশাল বিস্তার দেখিতাম।

---

*এখন তিনি বোম্বাইতে প্রধান হোমিও ডাক্তার। U. S. A. যাইয়া M.D. হইয়া আসিয়াছেন।

কুল কুল নাদে তটশালিনীর প্রবাহ অতীত গৌরব কাহিনী সকল স্মরণ করাইয়া দিত। মহেন্দ্রনাথ তাহাতে প্রাণ ও রস সঞ্চার করিয়া কত সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা বলিতেন। আপন মনে কবিতার অংশ বিশেষ আবৃত্তি করিতেন। একটু মনে আছে—

"অয়ি নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা
তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও।

*　　　*　　　*

নীল সলিল তব লোহিত ছিল কভু
পাণ্ডব কুরুকূল শোনিতে ও।
উড়িতে কি দেখিলে বৌদ্ধ পতাকা দেশবিদেশে ও।

*　　　*　　　*

তব তট পরে কত কত নগরী—
মোগল-পাঠান—
উদিল লয় পাইল ও।"

তাঁহার "ব্রজধাম দর্শন" নামক গ্রন্থে মথুরার কিঞ্চিৎ উল্লেখ রহিয়াছে। পাঠকবর্গকে তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কখনও কখনও বিশ্রাম ঘাটের দিকে বেড়াইতে যাইতাম। সেখানে সর্ব্বদা যাত্রীর ভীড় থাকিত। সেজন্য সেখানে অধিকক্ষণ বসিবার সুবিধা হইত না। যমুনার উপরে প্রকাণ্ড রেলের ব্রীজ, এক একদিন তাহার উপরেও যাইতাম। মথুরা নগরী অতি প্রাচীন সহর, উত্তর-দক্ষিণে যমুনা লম্বালম্বী। এক ধারে

যমুনা, বিপরীত দিকে মাটীর দোতলা সমান উচ্চ প্রাচীর, তাহা পূর্ব্বে তিন দিক বেষ্টন করিয়া নগরটী রক্ষা করিতেছিল। এখনও তাহার চিহ্ন বিস্তর রহিয়াছে। তথায়ও আমরা বেড়াইতে যাইতাম। সহরের মধ্যস্থল কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উচ্চ। রাস্তাগুলি প্রায়ই উত্তর দক্ষিণ লম্বা কিন্তু খুব প্রশস্থ নহে, রাস্তার দুইদিকে লাগালাগি বাড়ীর সারি। মাঝে মাঝে তোরণ দ্বার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। শিল্পকলার বিস্তর নমুনা তাহাতে দেখিতে পাওয়া যাইত। মহেন্দ্রনাথ তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন এবং প্রাচীন নগর নির্ম্মাণ প্রণালী বুঝাইতেন। গ্রীষ্মের সময় রাস্তার উপর প্রখর রৌদ্র অতি অল্পক্ষণের জন্যই দেখা যাইত, তাহাতে প্রাতে ও বৈকালে দুই পাশের বাড়ীর ছায়া পড়িত। বৃষ্টির জল ঢালু রাস্তার উপর পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই নগর ধৌত করিয়া যমুনায় চলিয়া যাইত। শত্রুর আক্রমণ হইতে সহরটী রক্ষার কৌশল সকল বুঝাইতেন। কংসের কেল্লা যাহা এখন কংসের টিলা বলিয়া খ্যাত, তাহার অবস্থানের গুরুত্ব এবং সুরঙ্গপথ ও জলের দিকে সিঁড়ির প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিতেন। এই সমুদয় তাহার "Principles of Architecture" প্রভৃতি গ্রন্থে অলোচিত হইয়াছে।

আমরা এবার মায়াবতী ফেরৎ বৃন্দাবনে আসিয়া অনেকদিক কিষণজীর দেখা পাই নাই। তাঁহার নানা তীর্থ ঘুরিয়া বৃন্দাবনে আসিতে কয়েক মাস বিলম্ব হইয়াছিল। তাঁহার দেশ দেখা ও তীর্থ ভ্রমণ করার এক বায়ু ছিল। ভারতবর্ষের ভিতরে ও

বাহিরে বহুস্থানে তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সে সকল ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও পূর্ব্ব জীবন কথা আমাদিগকে গল্প করিয়া শুনাইতেন। কখন কখন অভিনয় করিয়াও দেখাইতেন। তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ এখানে দিতেছি।

কিষণজী ১৪ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন, স্ত্রীর বয়স তখন নয় বৎসর মাত্র। বিবাহের দুই বৎসর পরে একদিন কি কারণে মনে নাই রাগ করিয়া দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং তদবধি নানা দেশ ও তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তিনি চারিধাম অর্থাৎ রামেশ্বর, পুরী, বদরিকাশ্রম ও দ্বারকাক্ষেত্র চারিবার দর্শন করেন। আসামের কামরূপে কিছুকাল ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের বৈষ্ণব প্রধান স্থান ঢাকা নগরীতে এক আখড়ায় দুই বৎসর কাটান। কলিকাতায় বহুবার গিয়াছেন. তথা হইতে মাদ্রাজ যান। পূর্ব্ব ঘাটের মহেন্দ্রপর্ব্বতে পথ হারাইয়া দুইদিন অনাহারে অরণ্যে বেড়ান। বোম্বাই প্রদেশেও অনেক স্থানে ছিলেন। আহমদাবাদে একবার রোগী হইয়া সরকারী হাসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসিত হন। তথা হইতে না বলিয়া চলিয়া আসেন। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া রিপোর্ট দেন। পুলিশ সেই সংবাদ তাঁহার দেশের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেয়। তদবধি তাঁহার স্ত্রী বৈধব্য আচরণ করিতে থাকেন। বহুকাল পরে কিষণজীর দর্শন পাইয়া তাঁহার বৈধব্য দশার অবসান ঘটে।

গুজরাট ও কচ্ছ দেশের সওদাগরগণ কিষণজীকে বড় ভালবাসিত। বিদেশে ব্যবসা করিতে যাইবার কালে সাধু

সঙ্গে করিয়া যাওয়া মঙ্গলসূচক বলিয়া তাহারা কিষণজীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত। ইহাদের সঙ্গে কিষণজী বেলুচী দেশের হিংলাজতীর্থে, আফগান দেশের কাবুল ও কান্দাহার এবং মধ্য এশিয়ার পূর্ব্ব-তুর্কীস্থানে গিয়াছিলেন। পরে আরেকবার মক্কা, মাদাগস্কার ও জাঙ্গীবার প্রভৃতি দেশে জাহাজে করিয়া বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন। এই সমুদয় দেশের বর্ণনা মহেন্দ্রনাথ বিশেষ আগ্রহ সহকারে শুনিতেন। কিষণজী লেখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু নানা দেশ ভ্রমণের ফলে তাঁহার এত অভিজ্ঞতা জন্মিয়া ছিল যে, আমরা কখনও তাঁহাকে মূর্খ ভাবিতে পারি নাই· তাঁহার বয়স কত তিনি বলিতে পারিতেন না। আমরাও অনুমান করিতে পারিতাম না। তাঁহাকে দেখিতে কোন সময়ই পঞ্চাশের বেশী মনে হয় নাই।

এককালে কিষণজী বৃন্দাবনে দাউজী (দাদাজী) অর্থাৎ বলরামের এক প্রস্তর নির্ম্মিত বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নিত্য পূজা ও ভোগরাগ এবং পার্ব্বণে ভাণ্ডারা ও সাধু সেবা সকলই হইত। তাঁহার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিতে উহা অন্যের হস্তগত হয়। তিনি বিনা প্রতিবাদে মন্দির ত্যাগ করিয়া মাটীর কুটীরে যাইয়া বাস করেন।

বহুকাল পরে একবার তিনি জন্মভূমি দর্শন করিতে যান। জয়পুর মহারাজার পুরোহিত বংশে তাঁহার জন্ম। গ্রামাঞ্চলে বিস্তর জমি-জমা ছিল, সেইখানেই পূর্ব্ব পুরুষগণ বসবাস করিতেন। সহরেও বাড়ী ছিল। একদিন নিজ গ্রামে যাইয়া

তিনি দেবতার স্থানে আসন পাতিলেন। পরদিন গ্রামে সাধু আসিয়াছে শুনিয়া এক এক করিয়া গ্রামবাসীরা সাধু দেখিতে আসিল। তিনি তাহাদিগকে পূর্ব্বেকার লোকদিগের কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহাদের প্রায় সকলেই গত হইয়াছে শুনিলেন। নিজ বাল্যকালের ঘটনাও জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহার কথাও অনেকে ভুলিয়া গিয়াছে দেখিলেন। কিষণজীর পুরাতন কথার উল্লেখে বৃদ্ধ লোকদের মনে সন্দেহ জাগে; নিজেদের মধ্যে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতে থাকে। সরকারী হাসপাতালে মৃত কিষণজী কি করিয়া ভূত সাধু হইয়া পুনরায় এখানে আসিতে পারে? পুলিশের রিপোর্ট তো মিথ্যা হইতে পারে না!

অবশেষে তাঁহার বৃদ্ধা জেঠাইমাতা আসিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বাল্য-কালের অস্ত্রোপচারের চিহ্ন রহিয়াছে দেখিয়া, তাঁহাকে তাঁহাদের লালা কিষণ বলিয়া ধরিয়া ফেলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে আলিঙ্গন করিয়া নিজগৃহে লইয়া যান। মুহূর্ত্তে এই সংবাদ রাজবাটীতে পৌঁছে। মধ্যাহ্নে তাঁহার বিরাট ভোজের ব্যবস্থা হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে ভোগ দেওয়া হয়। গ্রামশুদ্ধ লোক চতুর্দ্দিকে বসিয়া রহিয়াছে। কিষণজী বলিলেন, "আমার ইষ্ট দেবতার মুকুট ও অলঙ্কার ঐ সকল ধাতুতে তৈয়ারী হয়। আমি তাহাতে ভোজন করিব না।" অবশেষে পাথরের পাত্রে ভোজন করেন। ভোজনান্তে এক কক্ষে তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহার সেবায় নিযুক্তা করা হয়। কিষণজী সসম্ভ্রমে স্ত্রীকে স্বতন্ত্র

আসনে বসিতে বলিয়া মধুর বাক্যে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দেন। নানা উপদেশে তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া নিজ আসনে ফিরিয়া আসেন। স্ত্রী তখন বৃদ্ধা হইয়াছিলেন, সম্মুখের দাঁত পড়িয়া গিয়াছিল দেখিলেন। অতঃপর কিষণজীকে গৃহে রাখিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল এবং তাঁহার আসনের নিকট দিবারাত্র লোক পাহারায় নিযুক্ত রহিল। ইহাতে তাঁহার বন্ধন বোধ মর্ম্মান্তিক পীড়াদায়ক হইল। নিদ্রা নাই, তিনি দ্বিপ্রহর রাত্রিতে বসিয়া আপন উরুতে চাপড়াইয়া চাপড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—"ক্যোঁও কিষণ, তুম্‌নে সংযোগী বন্ যাওগে?" (সাধু বিবাহ করিয়া গৃহী হইলে সংযোগী সাধু হয়।) এই বলিয়া খুব চাপড়াইতে লাগিলেন। ইহাতে প্রহরীরা নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন হইল। তিনি লোটা মাত্র হাতে করিয়া শৌচের জন্য বাহির হইলেন। তাঁহার আসন যেমন তেমনই পড়িয়া রহিল। ক্রমে বহুদূরে চলিয়া গেলে পর দূর হইতে প্রহরীদের ও কুকুরের চীৎকার শুনিতে পাইলেন। তিনি দ্রুত চলিতে লাগিলেন, তাহারা আর তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। এই সমুদয় বিবরণ অভিনয় করিয়া হাসিতে হাসিতে আমাদিগকে বলিয়াছেন। বলিতে বহুক্ষণ লাগিয়াছিল। মহেন্দ্রনাথ পরে এইসব কথার উল্লেখ করিয়া মধ্যে মধ্যে হাসি ঠাট্টার আসর জমাইতেন। বৃন্দাবনে কিষণজীর সঙ্গ কত মধুর আনন্দময়ই না ছিল!

কিষণজীর শেষের দিকের আর একদিনকার কথা মনে পড়িল। আমরা বৃন্দাবনে থাকাকালে রেলষ্টেশনের নিকট

জয়পুরী বিরাট মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়। তাহার ভিতরকার দেওয়াল, থাম, মেঝে ও সিঁড়ি শ্বেত ও কৃষ্ণ পাথরের দ্বারা প্রস্তুত, তাহাতে ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ প্রকাশ—দেখিতেও মনোরম হইয়াছে। কৃষ্ণ ও শ্বেত প্রস্তরের সুন্দর বিগ্রহ শ্বেত-রত্ন বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। গরমের সময় বিগ্রহের বিশ্রাম কালে দিনে ও রাত্রিতে টানা-পাখার ব্যবস্থা হইল। কিষণজী কিছুদিনের জন্য পাখা-টানার চাকুরী করেন। বেতন মাসিক দেড় টাকা মাত্র ও একবেলার প্রসাদ। আমি মথুরা হইতে সেবাশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া দেখি কিষণজী সেবাশ্রমে সেবা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তখন একটী সেবক অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। আমি তাঁহাকে পাখা-টানা চাকুরীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রথম দিন কিছু উত্তর করিলেন না। পরের দিন আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিষণজী, চাকুরীর কি হইল?" তিনি বিস্ফারিত ঢুলুঢুলু নেত্রে কহিলেন, "বাবুজী, কিষণজী মন্দর মে কেতনে রোজ আটক্ রহেগা?" বুঝিলাম তাঁহার কিষণজী বিশ্বময় হইয়াছেন!

আমি এই বৎসরে শীতের শেষে একবার ব্রজমণ্ডলের নন্দগ্রাম ও বর্ষাণায় বেড়াইতে যাই। ইহার পূর্ব্বে একবার গিরি গোবর্দ্ধন, শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড দেখিয়া আসিয়াছি। এই সমুদয় স্থানে মহেন্দ্রনাথ পূর্ব্বেই গিয়াছিলেন। তাঁহাকে পাঠে নিযুক্ত দেখিয়া অনুমতি লইয়া আমি একাই চলিয়া গেলাম। বর্ষাণাতে লালাবাবুর কাছারিতে থাকিয়া নিকটস্থ স্থানগুলি দেখিতাম;

পাহাড়ী দেশ ছোট বড় টিলাময়। মন্দিরগুলি প্রায়ই পাহাড়ের উপর। নীচে গ্রাম এবং চাষের জমি। আমি প্রাতে বৈকালে বাহির হইয়া পাহাড়ে উঠিয়া, মন্দিরে দেবতা দর্শন করিতাম। একদিন অতি প্রত্যুষে নিকটস্থ টিলার উপর রাধারাণীর মন্দিরে যাইয়া দেখি, মন্দির দ্বার খোলার বিলম্ব আছে, ধৌত কার্য্য চলিতেছে। মন্দিরের পশ্চাতে যাইয়া বসিলাম, সম্মুখে বহুদূর বিস্তীর্ণ অরণ্য দেখিয়া মন উদাস হইল এবং রাধারাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "শুনেছি, বিশ্বাস করি না রাধারাণি, তোমার প্রেমের দেশ নাকি জাগ্রত! পরিচয় যেন পাই।" খানিক্ষণ এইভাবে কাটিবার পরে মন্দির দ্বার খোলার শব্দ শুনিতে পাইলাম। বিগ্রহ দর্শন করিয়া পূজকদের সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিলাম। পরে একটু দূরে জয়পুরী মন্দির নূতন প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া তথায় গেলাম। তথায় শ্বেত পাথরের ছড়াছড়ি দেখিতে পাইলাম। তখনও মন্দির প্রতিষ্ঠার বাকী ছিল। সেখান হইতে ফিরিবার সময় একটী ছোট টীলার উপর দোলনা দেখিতে পাইয়া তাহাতে যাইয়া উঠিলাম। তখন পেটে বেদনা অনুভব করিলাম এবং নীচে যাইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিয়া অশুচি অবস্থায় দ্রুত গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। জনশূন্য পথে একটী ২০।২২ বৎসরের যুবকের সহিত আলাপ হইল; সে আমাকে কেন যেন পাইয়া বসিল এবং তাঁহার গৃহে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। আমি আপন অশুচি বোধে যতই তাহাকে স্পর্শ করিতে নারাজ হই ততই সে

আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বাড়ীর আঙ্গিনার মধ্যে আমাকে টানিয়া লইয়া যায়। তখন তাঁহার মাতা ঘরের বারান্দা হইতে আহ্লাদের সহিত বলিতে লাগিলেন—"আও আও লালা, আও।" আমার নিজের অশুচি বোধ আমাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল, ইহা বলিতেও পারি না, আবার অনুরোধ এড়াইতেও পারিতেছি না। আমি যতই মিনতি করিয়া বলি, "মাই, হাম্ আভি ঘর যাওঙ্গে, থোরা বাদ ফির্ আওঙ্গা," ততই আমাকে যুবাটী তাঁহার ঘরের দিকে ঠেলিতে লাগিল। আমি তখন একেবারে ঘরের দ্বারদেশে আসিয়া পড়িলাম। নিরুপায় হইয়া মনে মনে বলিলাম, "রাধারাণি, তোমার প্রেমের রাজ্যে শুচি অশুচি ভেদ আর রহিল না; আমার অপরাধ নাই।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মাতাজী আমাকে একটী মোড়ার আসনে বসিতে দিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথায় দেশ,' 'কে আছে' ইত্যাদি। আমার সংসার করা হয় নাই, ঘুরে ঘুরে বেড়ানর জীবন বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, এবং আত্মীয়-স্বজনকে খুব গালি দিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কোন্ হইতে যুবকের বধূটী আপনা হইতেই দীর্ঘ ঘোমটা মাথায় আসিয়া বড় একবাটী গরম দুধ আমার সম্মুখে রাখিল। আমি যখন বলিলাম "আমি এত দুধ খাইতে পারিব না।" তখন 'নেই' বলিয়া সে এমন এক ধমক্ দিল যে আমি শাসিত বালকের মত দুধ পান করিতে বাধ্য হইলাম।

ব্রজবাসীদের দৃঢ় ধারণা যে, লালা অর্থাৎ বিশ্বপতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের ঘরের ছেলে, সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; নানা মূর্ত্তিতে ছলনা করিয়া দুধ খাইয়া যায়। আমাকে তাঁহারা 'লালা' জ্ঞান করিয়া যে এইরূপ প্রেমের ব্যবহার করিল তাহা তখন বুঝিলাম, পূর্ব্বে মাত্র শোনা ছিল। ব্রজমণ্ডল প্রেমের জাগ্রত স্থান বলিয়া আসিবার পূর্ব্বে শ্রীরাখাল মহারাজ কাশীতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আজ প্রত্যক্ষ করিয়া আমি ধন্য হইলাম। বুঝিলাম—ব্রজের মাটি আকাশ বাতাসময় 'লালা'। খেলার সাথী ও সখা নন্দরাজার লালার বংশীধ্বনি ব্রজবাসীরা শুনিতে পায়—নয়ন তাঁকে দেখিতে চায়—কিন্তু পায় না! তাই সকাল-সন্ধ্যা গোঠে-মাঠে যেখানে সেখানে তাঁহাদের প্রাণের ডাক শুনিতে পাইতাম এই গানে—

"দরশন দে রে নন্দকী লালা,<br>
বংশীকে বাজানেওয়ালে।<br>
এ বংশীকে বাজানেওয়ালে রে,<br>
বংশীকে বাজানেওয়ালে !!"

---

## পঞ্চম স্তবক

( কলিকাতায় গ্রন্থ লেখা আরম্ভ। পুরীতে রথ দর্শন—কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—লাহোর সেবাশ্রম—লাহোরে মার্শাল ল ও লাহোর ত্যাগ।

আমাদের ব্রজমণ্ডলের জীবনকথা সুধামাখা স্বর্গবাসের কথা! বৎসরাধিক কাল এইভাবে বৃন্দাবন, মথুরা ও ব্রজমণ্ডলে কাটিয়া গেল তৎপরে একদিন পানিঘাটের নূতন জমিতে আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন উৎসব সমাপ্ত হইল। আমরা কি কারণে মনে নাই উভয়ে ১৯১৬ সালের জুন মাসের শেষভাগে কলিকাতা চলিয়া আসি। আসিবার সময় মহেন্দ্রনাথ আমাকে সময় সময় বলিতেন, "আমার কেমন লিখিবার ঝোঁক আসিতেছে, জগৎকে আমার কিছু বলিবার আছে; কিছু না বলিয়া গেলে ঋণ শোধ হইবে না" ইত্যাদি। এবারে কলিকাতায় আসিয়া সর্ব্বক্ষণ নিজ মনে কি ভাবিতেন, লোকের সঙ্গ বড় ভালবাসিতেন না। দিবানিশি আপন ভাবে চুপ করিয়া থাকিতেন। পরে একদিন আমাকে বলিলেন, "কাগজ কলম লইয়া বস তো একটু। আমি বলিয়া যাই তুমি লিখিয়া যাও।" আমি প্রস্তুত হইলে তিনি অনর্গল বলিতে লাগিলেন, আমি লিখিয়া গেলাম। দিনের পর দিন প্রত্যহ প্রাতে দুই তিন ঘণ্টা তিনি বলিতে লাগিলেন আর আমি লিখিতে লাগিলাম। ক্রমে নানা বিষয়ের গ্রন্থ যথা—Principles of Architecture, Reflection on Women, Status of Woman, * Energy, Metaphysics, Philo-

---

* Reflection on Woman and Status of Woman এই দুইখানা গ্রন্থের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ মহেন্দ্রনাথের আদরের পণ্ডিতজী শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী করিয়াছেন।

sophy of Religion ও Mind প্রভৃতি গ্রন্থগুলি লিখিত হইল। ইহাতে প্রায় এক বৎসর কাল কাটিয়া গেল।

অতঃপর আমরা ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে হঠাৎ এক সুযোগে পুরী গমন করি এবং সমুদ্রের ধারে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে যাইয়া উঠি। ইহারই সন্নিকটে পূজনীয় শ্রীরাখাল মহারাজ ও পূজনীয় শ্রীহরিমহারাজ তখন ৺হরবল্লভ বাবুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা উভয়ে নিত্যই সমুদ্রে স্নান ও ৺জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতাম। ৺জগন্নাথের মন্দির মধ্যে জগমোহনের সর্ব্ব পশ্চাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেস্থানে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেন, সেখানে মহেন্দ্রনাথ যাইয়া দাঁড়াইতেন। তথায় পাথরের দেওয়ালে মহাপ্রভুর তিন অঙ্গুলীর তিনটী দাগ রহিয়াছে, তাহা দেখাইয়া আমাকে স্পর্শ করিতে বলিতেন এবং নিজেও স্পর্শ করিতেন। তথা হইতে এক একদিন নরেন্দ্রসরোবর, গুণ্ডিচা বাড়ী প্রভৃতি স্থানে যাইতাম। কোনও দিন বা টোটার গোপীনাথ, শঙ্করাচার্য্যের গোবর্দ্ধন মঠ, যবন হরিদাসের তপস্যার স্থান, সপ্ত বৈষ্ণব সাধুর সমাধি স্থান এবং স্বর্গদ্বার প্রভৃতি দর্শন করিয়া বাড়ী ফিরিতাম। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Antiquities of Orissa বইখানা বিমলদের বাড়ী হইতে আনাইয়া আমাকে পড়িতে দিলেন। তিনি ইহা পূর্ব্বেই পড়িয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহেন্দ্রনাথ একবার পুরী আসিয়া মাসাধিক কাল কাটাইয়া যান। তখন তিনি মহাপ্রভু সম্বন্ধে অনেক পুঁথি এবং উড়িষ্যার বহু

ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন এবং কোনারকের মন্দিরেও গিয়াছিলেন। মন্দিরের ও পুরীর সকল খুঁটিনাটিই তাঁহার জানা ছিল। মন্দিরের স্থাপত্য বিস্তার বিষয় অনেক কিছু বলিতেন। তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ তাঁহার Architecture গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। মহাপ্রভুর দেহাবসান সম্বন্ধে মতভেদের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন, "পুনরথযাত্রার দিন তিনি গুণ্ডিচা বাড়ীতে প্রাতে দেহত্যাগ করেন এবং ঐদিনই অপরাহ্নে রত্নদেবীর সম্মুখে মাটীতে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয় এবং তদুপরি একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর পাদুকা চিহ্ন স্থাপিত হয়।" আমি বহু পরে ঠিক এই কথাই ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের এক প্রবন্ধে পাঠ করি।

প্রথম রথযাত্রা দিবস দ্বিপ্রহরে আমরা পূজ্যপাদ শ্রীরাখাল মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীহরি মহারাজের সহিত একসঙ্গে পথপার্শ্বে এক বাড়ীতে অপেক্ষা করি। শ্রীরাখাল মহারাজকে পূজোপকরণ হস্তে সাঙ্গ-পাঙ্গ আমাদিগকে লইয়া পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিবামাত্র জগন্নাথ দেবের রথের গতি থামিয়া যায় এবং তাঁহার ও আমাদের সকলের পূজা গ্রহণ করিয়া রথ পুনরায় চলিতে আরম্ভ করে। শুনিলাম এরূপ সম্মান আর কাহাকেও দেখান হয় নাই। পুনঃ রথযাত্রার দিন মহারাজগণ ও মহেন্দ্রনাথ অসুস্থ ছিলেন, যাইতে পারেন নাই, আমরা গিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে মঠের শ্রীগোপাল মহারাজ ছিলেন মনে আছে।

দর্শনাদি সমাপন করিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে প্রায় নিত্যই

সন্ধ্যার পর পূজনীয় শ্রীরাখাল মহারাজকে আমি প্রণাম করিতে যাইতাম। তাঁহার নিকট তখন লোকের ভীড় মোটেই ছিল না। কোন কোনদিন দুই একজন ভক্তকে তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিতে দেখিতাম। তিনি আদর করিয়া বসিতে বলিয়া প্রসাদ খাইতে দিতেন এবং নানা প্রসঙ্গে আলাপ করিতেন। মঠের প্রথম সময়কার পুরাতন কথা ও স্বামিজীর কথা বলিয়া কতই না আনন্দ করিতেন। বলিতেন, "স্বামিজীর সবই অদ্ভুত রকমের ছিল। এই চৈতন্যময় পুরুষের কাছে সব সময় ঘেঁষা যেত না। আবার এক এক সময় কত নিকটের মানুষ হয়ে যেতেন! তাঁর প্রেমের থৈই আমরা পেতাম না। একদিনকার কথা শোন, প্রাতে একটু বেলায় এক মাতাল এসে নেচে গেয়ে হাসি তামাসা করে আসর খুব জমিয়ে তুলেছিল, সকলকে খুব আনন্দ দিয়ে ঘণ্টাখানেক বাদে একটু প্রসাদ হাতে নিয়ে বিদায় হল। তখন ঠাকুরপূজা হয়নি। স্বামিজী উপরে নিজের ঘরে বসে বিলাতী পত্রের জবাব লিখছিলেন ও মাতালের গান শুনছিলেন। মঠের খুঁটিনাটি কোথায় কি হচ্ছে সব তিনি টের পেতেন। মাতালটী চলে যাবার পর সিঁড়ির কাছে উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গেল রে সে?' সে চলে গেছে শুনে বললেন, 'কি দিলি তাকে খেতে, এত যে আনন্দ দিয়ে গেল?' 'প্রসাদ দিয়েছি হাতে' বলাতে চটে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ! লোকটার লাখ টাকার আমোদের বদলে একটু বাতাসা হাতে! ধর্ যা, এই টাকা দুটো দিয়ে আয়, বেশ আনন্দ করে খেতে বলিস।"

আমরা মাতালকে মদ খেতে পয়সা দিতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তাঁর ছিল প্রেমের দৃষ্টিতে কাজ, আমরা তাঁর বাঁধা গৎ বাজাচ্ছি, তাও ঠিক হচ্ছে না।

"আর একদিন আমেরিকার এক ভক্তের চিঠির ভিতর দু'হাজার টাকার একটী চেক্ এসেছিল। আমাকে ডেকে তাহা আমার হাতে দিলেন, আর বললেন, 'আমার যাবার পর সিষ্টার ক্রিশ্চিনা দেশে যেতে চাইবে, তখন টাকা কোথায় পাবি?' তাঁর যাবার আগে তিনি সবদিকের ব্যবস্থা এইভাবে করে গিয়েছেন।"

একদিন যাইয়া দেখি মহারাজ ভারি বিমর্ষ হইয়া বসিয়া আছেন। শরীর অসুস্থ কিনা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "না, মনটা বড় খারাপ রয়েছে। পুরাতন চাকরটা আজ চলে গিয়েছে। দেখ, আমার আকর্ষণ নাই, তেমন প্রেম নাই, তাইতো বেচারী চলে গেল!" তাঁহার ত্রুটীতে যে চাকরটী চলিয়া গিয়াছে তাহাই বার বার বলিতে লাগিলেন। প্রেমিকের মুখের কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। আমরা চিরদিন ভৃত্য-সেবক চলিয়া গেলে তাহার ত্রুটীর কথা শুনতেই অভ্যস্ত, এরূপ কথা এই প্রথম শুনিলাম। তাঁহার মন তিন দিন চঞ্চল ছিল।

পুনঃ রথযাত্রার পরদিন হঠাৎ আমার মাতাঠাকুরাণীর কঠিন পীড়ার সংবাদ আসে। তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার জগন্নাথ দর্শন অপেক্ষা মাতার দর্শন বেশী।" পূজনীয় হরি মহারাজও তাহাই বলিলেন। আমি উত্তর করিলাম, "আজ

গাড়ীর সময় নাই, কালই চলিয়া যাইতেছি। পরদিন যাইবার পূর্ব্বে প্রণাম করিতে গেলাম, তিনি বলিলেন, "ঢাকায় দূরদেশে যাইতেছ সঙ্গে টাকা আছে তো ? নতুবা লইয়া যাও, সঙ্কোচ করিও না।" এই বলিয়া টাকা নিবার জন্য বার বার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমার লইবার প্রয়োজন হয় নাই। তিনি ঠিকানা দিয়া পৌঁছান ও মায়ের সংবাদ দিবার কথা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। আমি দেশে পৌঁছাইয়াই পত্র দিলাম, তিনি উত্তর দিলেন। পরে মাতৃ-বিয়োগ ঘটিলে জানাইলাম। তিনি সান্ত্বনা দিয়া শেষ এক পত্র দিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের অকৃত্রিম প্রেমের ব্যবহার ভুলিবার নহে। মহাপুরুষগণের এই সমুদয় পুণ্য স্মৃতিকথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও স্থানে স্থানে বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

আমি পুরী হইতে চলিয়া আসার অল্প দিন পরে মহেন্দ্রনাথও কলিকাতায় চলিয়া আসেন। আমার কলিকাতা ফিরিতে দুই মাস গৌণ হয়। আমি পুরীতে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হই। কলিকাতা আসার পরেও সাত মাস পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়া জ্বরে কষ্ট পাই। আমার কথা শুনিয়া পূজনীয় শ্রীরাখাল মহারাজ আমাদিগকে কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে চেঞ্জে যাইতে বলেন এবং নিজে কল্যাণানন্দ স্বামিজীকে পত্র দেন। ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে আমরা কনখল সেবাশ্রমে যাই। তখন গাছে আমের কড়া দেখিয়াছিলাম। নিশ্চয়ানন্দ স্বামিজী আমাদের লইয়া আমের আচার প্রস্তুত করেন মনে আছে।

কল্যাণানন্দ স্বামিজী আমাদের খুব যত্ন করিয়া রাখেন এবং দুই মাসের মধ্যে আমি সুস্থ ও সবল হই। তখন স্বামী ধর্ম্মানন্দজী ও স্বামী কৃষ্ণানন্দ ( বৃন্দাবনের পুরাতন কর্ম্মী ) তথায় ছিলেন। আমরা মাঝে মাঝে চণ্ডীর পাহাড়ের সম্মুখে নীল ধারায় নৌকার উপর যাইয়া বসিতাম। দক্ষযজ্ঞের ঘাটে, ব্রহ্মকুণ্ড ও ক্যানেল খালের ধারে বেড়াইতে যাইতাম এবং বসিয়া নানা প্রসঙ্গের আলাপ, কখনও বা ধ্যান করিতাম। গঙ্গার ধারে হিমালয় সম্মুখে করিয়া বসিয়া মহেন্দ্রনাথ বিমুগ্ধ চিত্তে অনেক সময় বলিতেন—"গাঙ্গেয় হিমাচল প্রদেশটিকে দেবভূমি জানিবে। যুগযুগান্তের তপঃপূত এই ভূখণ্ডের তুলনা মর্ত্তে মিলে না। আলপস্, বল্কান্, ককেসাস এবং এলবুর্জ্জ পর্ব্বতে এই আকর্ষণ নাই। তথায় গেলে পালাই পালাই মনে হয়। এমন কি দার্জ্জিলিঙ্গেও এ ধ্যান আসে না। আর্য্যগণ চিরদিন এই দেবভূমি হইতে ঔষধ, ঐশ্বর্য্য, রূপ, ছন্দ, কাব্য, ধ্যান, জ্ঞান, মোক্ষ পর্য্যন্ত আহরণ করিয়া আসিয়াছে।" এই সব বলিয়া বার বার প্রণাম করিতেন। সান্ধ্য গগনে শশধরতিলক চণ্ডীর ধূসর পাহাড়টী চন্দ্রচূড়-রূপ ধারণ করিয়া সে প্রণাম গ্রহণ করিত।

অতি প্রাচীন সাধু যোগী স্বামী স্বরূপানন্দজী তখন জোয়ালাপুরে নিজ আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। ধর্ম্মানন্দজীর সঙ্গে আমি দুই তিন দিন তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই এবং তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া উপকৃত হই। তিনি যেমন জিজ্ঞাসুমাত্রকে সহজ সরল কথায় উপদেশ ও আশা

দিতেন, তেমনই অর্থ দানেও মুক্ত হস্ত ছিলেন। দরিদ্র গ্রামবাসীরাই তাঁহার নিকট অধিক আসিত। কতিপয় রাজাও তাঁহার শিষ্য ছিল। নিজ অপেক্ষা হীন ও নীচ বা অধীন জনের প্রতি প্রেমের ব্যবহারে ধার্ম্মিকের ঠিকানা হয় আর সকলের আশীর্ব্বাদ লইতে তিনি বলিতেন। আশ্রম ত্যাগের তত পক্ষপাতী ছিলেন না। মানুষ যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই পরমেশ্বরকে অনুরাগের সহিত ডাকিয়া তাঁহার কৃপা লাভে ধন্য হইতে পারে বলিতেন। তিনি এক বড় কলকী ও লম্বা নলযুক্ত গড়গড়াতে সারাদিন তামাক টানিতেন। কাহারও কাছে যাইতেন না। কখনও কখনও বড় রাস্তায় যাইয়া সিকি-দুয়ানি ও পয়সা ছড়াইতেন এবং বালক ও দরিদ্রলোকের সংগ্রহ দেখিয়া আনন্দ করিতেন। শুনিয়াছি শ্রীরাখালচন্দ্র মহারাজ তাঁহাকে মান্য দিতেন।

আমি একটু সুস্থ হইলে একাই হৃষিকেশ, লছমনঝোলা, দেরাছুন ও মুসৌরী প্রভৃতি স্থানে বেড়াইয়া আসি। মহেন্দ্রনাথ সেবাশ্রমে থাকেন। পরে কৃষ্ণানন্দজীর সহিত একবার দিন কতকের জন্য হৃষিকেশ ও লছমনঝোলা বেড়াইতে যান। তখন তাঁহার লেখার প্রতি ঝোঁক ছিল না, ধ্যানের ভাবই প্রবল।

ঠিক এইসময় আমাদের বন্ধুবর বৃন্দাবনের পুরাতন কর্ম্মী স্বামী সেবানন্দ লাহোরে যাইয়া এক সেবাশ্রম খুলিয়া সেবা কার্য্য শুরু করিয়া দেন এবং আমাদিগকে তথায় যাইয়া তাঁহার

সেবাকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য বারম্বার পত্র লেখেন। বন্ধুবরের আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। প্রথমে আমি একাই আষাঢ় মাসের শেষে লাহোরে চলিয়া যাই। ভাদ্রমাসে মহেন্দ্রনাথ ও আশ্বিনমাসে ব্রহ্মচারী চিন্তাহরণ তথায় গমন করেন। ব্রহ্মচারী চিন্তাহরণের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, তথাপি তিনি পূর্ণোত্তমে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া স্নানান্তে বেদপাঠ করিতেন। তাঁহার মধুর কণ্ঠধ্বনি ব্রহ্মাবর্ত্তের দারুণ শীতের নিশীথ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আমাদের সকলকে প্রত্যহ প্রত্যূষে ব্রহ্মমন্ত্রে প্রবুদ্ধ করিত। এই সময় তিনি কতিপয় উপনিষদ গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন ও যখন তখন তাহা আবৃত্তি করিয়া আমাদিগকে শুনাইতেন। অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয়।

এখন হইতে লাহোর সেবাশ্রমের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। প্রত্যহ প্রাতে লাহোরী দরজায় শতাধিক ও বৈকালে শালিমার দরজায় ২৫।৩০টি রোগী দেখিয়া ঔষধ বিতরণ করা হইত। প্রায় ৬০টি দরিদ্র পরিবারকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করা যাইত। ইহা ছাড়া অভাবী লোকদিগকেও বস্ত্র এবং কম্বল বিতরণ করা হইত। স্কুলের ১০।১২টি দরিদ্র ছাত্রকে পুস্তক ও বেতন দিয়া সাহায্য করা হইত। এই ভাবে সেবাকার্য্য ক্রমে বাড়িয়া চলিল। স্থানীয় লোকের বিশেষ অনুরোধে একটী বালক ও বালিকাদের জন্য পাঠশালা খোলা হইল। দুইটি মুলতানী গরু পোষা হইল। তাহাতে নিত্য ১২।১৩ সের দুগ্ধ হইত। তাহার

অধিকাংশ রোগীদের মধ্যে বিতরিত হইত। একটি ঘোড়া ও টাঙ্গা কেনা হইল। সহিস ও কোচোয়ান নিযুক্ত হইল। পাচক ও চাকর দুইজন ছিল। দুপুরে টাঙ্গায় করিয়া অশক্ত রোগীদিগের বাড়ীতে যাইয়া দেখা হইত। সেবাশ্রমের কার্য্য তখন আনারকলীর নিকট লাহোরী দরজায় এক তেতালা মাঝারি রকমের বাড়ীতে চলিতেছিল। গরু ঘোড়ার জন্য পৃথক বাড়ী ভাড়া করা হয়। পাঠশালার জন্য দুইটি ঘর ভাড়া নেওয়া হয়। সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের যথা—ব্যারিষ্টার ( তখন প্রিন্সিপাল ) গোকুলচাঁদ নারাঙ্গ, ব্যারিষ্টার লালা দুনিচাঁদ, দুর্গাদাস উকিল প্রভৃতির দৃষ্টি নবজাত সেবাশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা মাঝে মাঝে সেবাশ্রমে আসিতেন এবং কার্য্য দেখিয়া উৎসাহ দিতেন। তাঁহাদের পারিবারিক চিকিৎসাও সেবাশ্রমের ঔষধেই হইত। সেবাশ্রমের প্রতি লোকের এত বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, দূর দূর দেশ হইতে, এমন কি কাশ্মীর-জম্মু হইতেও বড় লোকদের পরিবারের রোগী আসিত এবং আশ্চর্য্য রকমে অল্পকাল মধ্যে আরোগ্য হইয়া যাইত।

স্বামিজীর জন্মতিথি পূজা ও উৎসব সুন্দররূপে সম্পন্ন করা হয়। বহু দরিদ্র গৃহস্থ ও ছাত্রদের বসাইয়া মিষ্টান্ন ও লুচি ভোজন করান হয় এবং এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্বামিজী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং 'সন্ন্যাসীর গীতি' আবৃত্তি ও ভজন গান হয়। মহেন্দ্রনাথ বর্ণিত স্বামিজীর জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমি লিখিয়া পাঠ করি।

ডি, এ, ভি কলেজের অধ্যক্ষ গোকুলচাঁদ নারাঙ্গের হিন্দী বক্তৃতা অতি সুন্দর ও আবেগপূর্ণ হইয়াছিল। বিবেকানন্দ স্বামিজী সম্বন্ধে তিনি তুইটি নূতন কথা শুনাইলেন। তিনি বলিলেন যে, স্বামিজী যখন ১৯০০ সালে লাহোরে আসেন এবং বক্তৃতা করেন তখন তিনি কলেজের ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবক। টাউন হলে অপরাহ্নে স্বামিজীর বক্তৃতা করিবার আধঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি তুইটি বন্ধুসহ স্বামিজীকে আনিতে যান। যাইয়া দেখেন তিনি গভীর নিদ্রামগ্ন। কাহারও জাগাইবার সাহস নাই। প্রায় কুড়ি মিনিটকাল বিশেষ চঞ্চলতার সহিত তাঁহাদের কাটিবার পর দেখেন, স্বামিজী হঠাৎ উঠিয়া শৌচাগারে গেলেন এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া গেরুয়া আলখাল্লা গায়ে দিয়া পাগড়ি বাঁধিতে শুরু করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক ইংরাজ সাহেব জানু পাতিয়া তাঁহার পায়ে বুট পরাইয়া ফিতা বাঁধিতে লাগিলেন। ইংরাজ সাহেবকে ভারতবাসীর পায়ে জুতা পরাইতে দেখিয়া তাঁহার মনে সঙ্কোচ আসিল এবং অমনি নিজে জুতার ফিতা বাঁধিতে গেলেন। স্বামিজী তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন— "না, না, দেখে যাও যোগ্য হলে ইংরাজ দিয়াও নেটিভের জুতার ফিতা বাঁধান চলে।" ইহার পর স্বামিজীকে লইয়া যখন টাউন হলে পৌঁছেন তখন দেখেন সভা আরম্ভ হইতে তুই মিনিট বাকী আছে। স্বামিজীর ভিতর যেন এলার্ম্ম দেওয়া ছিল। অদ্ভুত ছিল তাঁর সময় জ্ঞান ও অসাধারণ স্বজাতি-প্রীতি!

লাহোরে অবস্থান কালে আমাদের সর্ব্ব বিষয়ে প্রাচুর্য্য

ছিল। পাচক, চাকর, সহিস, কোচোয়ান, কর্ম্মী ও সেবক পাঁচটী ছাড়া নিত্য দু-তিনটী অতিরিক্ত লোকও ভোজন করিত। আশ্রমে থাকিয়া একটী শিখ সর্দ্দার অজয় সিং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা করিত। একটী অনাথ বালক বাস করিত ও পড়িত। যেমন লোকজন, তেমন অর্থাগম ও তেমনই ব্যয় বিতরণ চলিয়া ছিল। ঔষধ, পথ্য, আটা, দুধ, কম্বল, লেপ, জামা ও টাকা বিতরণ হইত। অভাবগ্রস্ত কেহই বিমুখ হইত না। আশ্রম-বাসীরাও যথেষ্ট খাইতে পাইত। সকলেরই স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছিল। সকলেই পরিশ্রম করিত এবং অবসর সময় গাড়ী করিয়া বেড়াইতে যাইত ও আমোদ করিত। আমরা এক একদিন জাহাঙ্গীর ও নূরজাহাণের সমাধি স্থান, ঔরঙ্গজেবের মস্‌জিদ এবং তিন থাক্ সালিমার বাগান, মিয়ান্‌মীর ক্যাণ্টনমেণ্ট, অমৃতসহর এবং পেশোয়ার যাইবার জি, টি, রোড দিয়া গ্রামাঞ্চলে বেড়াইতে যাইতাম। কত গৃহস্থ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়াছি, তাহা স্মরণে আজ যুগপৎ দুঃখ ও আহ্লাদ হইতেছে।

প্রথম যুদ্ধের বিজয় উৎসবের পর হইতে ১৯১৮ সালের হেমন্তকালে পৃথিবীব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ দেখা দেয়। লাহোরে তাহা মহামারীর আকার ধারণ করে। গ্রাম অঞ্চলের অবস্থা ভীষণ হয়। পথে ঘাটে রোগী পড়িয়া থাকিত। আত্মীয়-স্বজন রোগীকে ফেলিয়া পালাইত। শীতের প্রকোপ বাড়িতে থাকিলে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠে। কর্ম্মবীর সেবানন্দ অগ্রবর্ত্তী হইয়া রোগীর সেবাকার্য্য ও চিকিৎসা চালাইতে থাকেন ; প্রায়

আট শত রোগীর সেবা ও চিকিৎসা চারি মাস ধরিয়াহইয়াছিল। আমাদের আহারাদির সময় ছিল না। পাচক ও চাকর রুগ্ন হইলে নিজেদেরই রন্ধনাদি করিয়া খাইতে হইত। দুই একদিন মহেন্দ্রনাথকেও ভাত রাঁধিতে হইয়াছিল। একদিন এক মুমূর্ষু রোগীকে রাস্তা হইতে তুলিয়া আনা হয় এবং রাত্রিতে মহেন্দ্রনাথের বড় ঘরটীর একপার্শ্বে রাখা হয়। রোগী অর্দ্ধরাত্রিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। মহেন্দ্রনাথ নির্ব্বিকার চিত্তে মৃতকে লইয়া রাত্রি যাপন করেন। সকল অবস্থাতেই তাঁহার অবিকৃত মনোভাব চিরদিন লক্ষ্য করিয়াছি। নিজে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া আমাদের কর্ম্মশক্তি জোগাইতেন।

আমরা সেবাকার্য্যে সারাদিন ব্যস্ত থাকিতাম। মহেন্দ্রনাথ প্রাতে পুস্তক লেখা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার পিতা ৺বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় লাহোরে যখন উকিল ছিলেন তখন তাঁহার যুবক ক্লার্ক (নাম স্মরণ নাই, এখন বৃদ্ধ) আশ্রমে আসিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কানাইলালকে ( বি, এ, সেক্রেটারিয়েটের কেরাণী ) মহেন্দ্রনাথের পুস্তক লেখা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। প্রত্যহ প্রাতে মহেন্দ্রনাথ অনর্গল বলিয়া যাইতেন ও কানাইলাল লিখিয়া যাইত। অনেক পুস্তক এই ভাবে লাহোরে লেখা হয়।

মহেন্দ্রনাথ অবসর সময়ে আগত ভদ্রলোকদের সহিত নানা প্রসঙ্গে আলাপ করিতেন। রাঘব দাস, রাম শেঠ, লালা ভূপনারায়ণ, গোবিন্দজী ও লালা কিষণ সিং প্রভৃতি তাঁহার

নিকট প্রায়ই বৈকালের দিকে আসিতেন এবং আলাপ জমাইয়া তুলিতেন। সিরাজী নামে আর একজন পাঞ্জাবী মুসলমান যুবক মাঝে মাঝে আসিতেন। তিনি সাধু প্রকৃতির লোক ও আরবী-ফারসীতে ভারি লায়েক ছিলেন। ইঁহারা সকলেই মহেন্দ্রনাথের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের সহিতও নানাস্থানে বেড়াইতে যাইতেন।

সেবাশ্রমের কার্য্য দেখিয়া দানবীর মহাপ্রাণ বৃদ্ধ লালা গঙ্গারাম এত খুসী হইয়াছিলেন যে, যখন যাহা চাহিতাম, তিনি তখনই তাহা দিতেন। ইহা ছাড়া তাঁহার বাড়ী গেলেই দুই এক শত টাকার নোট হাতে গুঁজিয়া দিতেন। ব্যাঘ্রের মত তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি—চাহিবামাত্রই বুঝিতে পারিত আমাদের কত কি প্রয়োজন। ১৯১৯ সালের মার্চ্চ মাসে একদিন তিনি ডাকিয়া পাঠান এবং বলেন যে, "লাহোরী দরজার বাহিরে বাগানের মধ্যে সেবাশ্রমের জন্য জমি খরিদ করিলে হয় না? আমি সেজন্য এই ছয় হাজার টাকা জমা রাখিলাম। একটি কমিটী গঠন করিয়া জমি খরিদ ও বাড়ী প্রস্তুত কর।" ইহার পরে জমি দেখা হইল এবং কথাবার্ত্তাও চলিতে লাগিল। অনেক দূর অগ্রসর হইবার পরে অকস্মাৎ বজ্রপাত হইল— 'রাওলাত বিল' পাশ হইল! প্রতিবাদের ফলে অমৃতসহরে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটিল। দেশে সর্ব্বত্র বিক্ষোভ দেখা দিল। লাহোরে সাত দিনের হরতাল শুরু হইল। কাহারো বাড়ীতে রান্নার পাট নাই। লোকেরা রাস্তার লঙ্গর-

খানায় ভোজন করিত আর 'রাওলাত বিল হায় হায়', 'জালিয়ানওয়ালাবাগ হায় হায়', 'বন্দেমাতরম্'—ধ্বনি করিয়া দিবারাত্র রাস্তায় দল বাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। এইভাবে সহরবাসিগণ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। কাজ-কর্ম্ম, অফিস-কাছারি একরূপ প্রায় বন্ধ হইল।

হিন্দু-মুসলমান তখন অভেদ ও একনিষ্ঠ। সকলেই মিলিত হইয়া সভা-সমিতিতে প্রতিবাদ চালাইতে লাগিল। শোভাযাত্রা বাহির করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিল। হিন্দু অনেকে গুলি খাইয়া মরিল। প্রতিবাদে রেলের কারখানা ত্যাগ করিয়া মুটে, মজতুর ও মিস্ত্রিগণ পর্য্যন্ত বাহির হইয়া আসিল। রেল চলাচল বন্ধপ্রায় হইল। পত্রিকার সমালোচনা ও প্রাচীর-পত্র সকল ইংরাজের মস্তিষ্ক গরম করিয়া দিল; ইংরেজ সরকার এই উত্তেজনা কোনমতেই শান্ত করিতে পারিল না। সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। লাটসাহেব নিজে পর্য্যন্ত বাজারে আসিয়া দোকান খুলিতে অনুরোধ করিলেন। কেহই তাঁহার কথা শুনিল না। অবশেষে মিলিটারীর হস্তে শাসন ভার দিতে বাধ্য হইলেন। 'মার্শাল ল' (সামরিক আইন) জারী করিলেন। শৃঙ্খলা আনিবার জন্য জোর জুলুম মারপিট নিষ্ঠুর অত্যাচার শুরু হইল। ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ হীনবুদ্ধির আশ্রয় লইয়া নিজ জাতীয় গৌরব অতল জলে ডুবাইয়া দিল। বৃটিশ রাজত্বের ইতিহাসে সেই কলঙ্ক মুছিবার নহে। ভারতবাসীর নীরব সাশ্রু দীর্ঘশ্বাস ঐ রাজত্বের অবসান দ্রুততর ঘটাইয়াছে সন্দেহ

নাই। আইন ও শৃঙ্খলার নামে অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ হইল। আহা, কত মরিল! অর্থের দাস ভারতীয় কর্ম্মচারিগণ বিদেশীয়ের আদেশে নির্দ্দোষ জাত-ভাইদের উপর বন্দুকের গুলি, লাঠি ও বেত্রাঘাত চালাইয়া পদোন্নতি অর্জ্জন করিল। কারখানার মজুরদের বসতি এবং সন্দিগ্ধ ব্যক্তির খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার কালে ইংরেজকর্ত্তৃক অসহায়া নারীগণের মর্য্যাদাহানির বিবরণ নিপীড়িতের মুখে শুনিয়া এবং রাস্তায় প্রকাশ্য স্থানে তারের খাম্বার সঙ্গে সন্দিগ্ধকে বাঁধিয়া পাঠান দ্বারা বেত্রাঘাত প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রতিবাদের ফলে আমাদের প্রধান কর্ম্মী সেবানন্দজী গ্রেপ্তার হইলেন। তাঁহার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিল। হরতালে যোগ দেওয়ায় সহরবাসী সকলেই দোষী। লোকজন ও দোকানদার সকলেই আতঙ্কে সহর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। রোগী নাই, গরু-ঘোড়ার খাদ্য নাই; সেবাশ্রম অচল হইল, অগত্যা আমরাও উহা ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। বিমুক্ত গরু ও ঘোড়া এবং গাড়ী, ঔষধ ও পুস্তকাদি যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার যেমন তেমনই পড়িয়া রহিল!

আমরা তিনজনে একদিন বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে রেল চলাচল বন্ধ শুনিয়া সহরের বাহিরে গোয়ালমুণ্ডীতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, ই, (বর্ত্তমানে নাগপুর ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ) মহাশয়ের বাড়ীর ত্রিতলে যাইয়া উঠিলাম। তথায় তুদিন পরে ব্রহ্মচারী চিন্তাহরণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। বিপদের উপর বিপদ! তখন এক-

কৌটা ঔষধও সঙ্গে ছিল না। কিন্তু এই দুর্দ্দিনে লাহোরবাসী বন্ধুগণ বিশেষ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের পুত্র রাঘবদাস এবং পি, ডাব্লিউ ডির হেডক্লার্ক—লালা ভূপনারায়ণ সিং আমাদের সকল অভাব মোচন করিয়া রক্ষা করেন। নিজেরা বাজার করিয়া অর্দ্ধভাগ আমাদিগকে দিয়া যাইতেন, আটা ও চাউল পাঠাইতেন, দেখা করিয়া টাকা দিয়া যাইতেন, ইঁহাদিগের সহৃদয় ব্যবহার অন্তরে চির গাঁথা রহিয়াছে।

ভারতের সর্ব্বত্র লাহোরের অত্যাচার নিন্দিত হইলে উহা বন্ধ হয় এবং বাহিরে যাতায়াত ও রেলগাড়ীর যোগ শুরু হয়। খাদ্য দ্রব্যের সুলভ দোকান সরকার নিজে খুলিয়া দেন, ক্রমে সহরে শান্তি ফিরিতে লাগিল। আমাদের ঘরে ঐ রোগী আর বাহিরে এত আলোড়ন বিলোড়ন মহেন্দ্রনাথ পাশের ঘরে আপন আসনে প্রশান্ত চিত্তে শিবস্মরণে মাসাধিককাল কাটাইয়া দিলেন। চিন্তাহরণজী সুস্থ হইলে একমাস পরে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে অতি প্রিয় লাহোরবাসীদের প্রেম ও সুখ-দুঃখের স্মৃতি, দুই সপ্তাহের নিত্য শোভাযাত্রা ও সভায় গুলি চালনা এবং হরতালাদির উত্তেজনা, আর চারি সপ্তাহের সামরিক আইনের অধীনে সন্ত্রস্ত জীবনের অভিনব অভিজ্ঞতা লইয়াই লাহোর পরিত্যাগ করিব স্থির করিলাম।* রেল গাড়ীর চলাচল শুরু

*গত্যন্তর ছিলনা। লাহোর বাসীদের মানসিক অবস্থা তখন নিতান্ত চঞ্চল, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। এক বৎসর পরে পণ্ডিত রাঘব দাস কতিপয় লাহোর বাসিসহ আমাদের খোঁজে বৃন্দাবন সেবাশ্রমে আসিয়াছিলেন।

হইলে ও যাতায়াতের নিষেধ আজ্ঞা উঠিয়া গেলে একদিন আমরা তিনজনে বৃন্দাবন রওনা হইলাম। পথে দিল্লী ষ্টেশনে এক রাত্রি বাস করিতে হইল। গ্রহের প্রকোপ আমাদের তখনও কাটে নাই—কিছু বাকী ছিল। মধ্যরাত্রে এক গুপ্তচর পুলিশ ডাকিয়া আনিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া বলিল, ইহারা লাহোর পলাতক। পুলিশ থানায় গিয়া নাম ঠিকানা লিখাইতে ও নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে হুকুম করিল। সঙ্গী দুইজন প্রতিবাদ শুরু করিলেন। কথা কাটাকাটী খুব চলিল। লোকের ভীড় জমিল। আমি গতিক সুবিধা নয় মনে করিয়া একটু দূরে সরিয়া যাইয়া হিন্দুস্থানী পুলিশকে বলিলাম, "সাধু লোগকো ফজুল হায়রাণী নাহি করনা ভাইয়া।" তৎপরে আকার ইঙ্গিতে বুঝিলাম ইহারা শুধু মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট হইবার নহে। অগত্যা সুদর্শনচক্র দুই হস্তে প্রয়োগ দ্বারা অব্যাহতি পাইলাম।

---

তখন আমরা কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছি। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল লাহোরে পুনরায় সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করা। সে জন্য আমাদের পত্র ও লিখিয়া ছিলেন। আমাদের আর যাওয়া হয় নাই।

## ষষ্ঠ স্তবক

( বৃন্দাবনে নূতন সেবাশ্রম—কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন—কিষণজী ও নাহু মহারাজের তিরোধান )

পরদিন আমরা তিন জনে মথুরা হইয়া বৈকালে বৃন্দাবনে পৌঁছিলাম। বৃন্দাবনে আসিয়া দেখিতে পাই যে, পানি-ঘাটের নূতন জমির উপর সেবাশ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষ রোগীর জন্য স্বতন্ত্র আবাস, বসন্ত ও কলেরা ওয়ার্ড, আউটডোর ডিসপেন্সারী, কর্ম্মীদের বাসগৃহ ও রন্ধনশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। শাক সবজী ধান্য ও গমের চাষ হইতেছে। শতাধিক গোলাপ গাছসহ অন্যান্য ফুলের গাছ দ্বারা সুশোভিত বাগান প্রস্তুত হইয়াছে। সর্ব্বত্র ইঁদারা হইতে পাম্প দ্বারা জল তুলিয়া জলসেচ দেওয়া হইতেছে। এই সমুদয় কার্য্য সমাধা করিয়া নাহু মহারাজ বেলুড়মঠে রাজা মহারাজের নিকট গিয়া অবস্থান করিতে ছিলেন। সেবাশ্রম পরিচালনার ভার তখন বুড়োবাবার ( স্বামী শ্রীধরানন্দজীর ) উপর ন্যস্ত ছিল, তখন তাঁহার বয়স ষাটের উপর হইবে। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার কর্ম্ম শক্তি, নিষ্ঠা ও নিপুণতা দেখিয়া আমরা তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতাম।

তিনি কর্ম্মীও রোগীদিগকে বিশেষ যত্ন করিতেন ; মহেন্দ্র-নাথকে তিনি তাঁহার নিকট আশ্রমের উত্তর-পশ্চিম কোনে

ছোট পাকা ঘরে রাখিয়া সর্ব্বক্ষণ নিজে সেবা যত্ন করিতেন। আমি ও ব্রহ্মচারী চিন্তাহরণ যমুনার নিকট বড় চালা ঘরে অন্যান্য কর্ম্মীদের সহিত থাকিতাম। আমি পূর্ব্ববৎ মাঝে মাঝে মথুরায় ডাক্তার শ্রীঅবিনাশের বাড়ীতে যাইতাম। একবার ভীষণ গরমের সময় মথুরাতে থাকাকালীন আমি দৌকালীন জ্বরে মাসাধিককাল ভুগিয়া উঠি। ডাঃ অবিনাশ ভায়া সস্ত্রীক আমার সেবা-যত্ন করিয়া আমাকে আরোগ্য করেন। তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিবার নহে।

মহেন্দ্রনাথ কিন্তু এবার বৃন্দাবনে আসিয়া মথুরাতে কিংবা অন্য কোথাও বেড়াইতে যাইতেন না। লেখকের অভাবে লেখা বন্ধ ছিল। সকাল সন্ধ্যায় আবক্ষদীর্ঘ যষ্টি হস্তে যমুনার ধারে ধারে পায়চারি করিতেন ও দেখিতেন—প্রাতে শত শত গোধন যমুনা পায় হাঁটিয়া কিংবা বর্ষার খরস্রোতের জলে সাঁতার কাটিয়া পার হইতেছে এবং অপর পারে বিচরণ করিতেছে। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে তাহারাই আবার রক্তিম গগনে ধূলি উড়াইতে উড়াইতে ঘরে ফিরিতেছে। আমাদিগকে ঐ সকল দেখাইয়া নিজ করুণ সুরে গাহিতেন—

"গোধন ফিরে ধীরে ধীরে ধীরে গগনে ছাইল রেণু,
হাম্বা হাম্বা হাম্বা রবে, গোধন ফিরে ধীরে ধীরে"। ইত্যাদি

কদাচিৎ আত্মহারা হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেন, যমুনার অপর পারে দূরে মৃগযূথ ছুটিতে ছুটিতে আকাশের কোলে বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। সময় সময় ঐ

সমুদয় অভিরাম দৃশ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। আমাদের কি সে চক্ষু ছিল যে, নিমগ্ন দৃষ্টিতে উহা দেখিব?

আশ্রমের অধিবাসিরূপে আট দশটী ময়ূর বৃক্ষোপরি বাস করিত। তাহারা নিঃসঙ্কোচে আমাদের আশেপাশে বিচরণ করিত। ঘরের কোনে ঝোপের মধ্যে বসিয়া ময়ূরী ডিমে তা দিত। ময়ূরগুলি যেখানে সেখানে পেখম ধরিয়া নাচিত ও দিগন্ত কাঁপাইয়া কেকা ধ্বনি করিত। সেখানে প্রভাতে কাক ডাকিত না। কেকা রবই রজনীর অবসান জানাইয়া আশ্রমবাসীদিগকে জাগাইয়া তুলিত।

ইহা ছাড়া রাত্রিকালে বহু খরগোস ও সজারু স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত। তিনটী ভাল জাতের কুকুর পোষা হইত। বানরের দৌরাত্ম্য বড় ছিল না। আশ্রমটী সহরের বাহিরে ছিল বলিয়া লোক সমাগমও কম হইত; তবে কিষণজীও আর তুচারজন ভদ্রলোক প্রায় নিত্যই আসিতেন। এই শান্ত মধুর পরিবেশের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ আপন মনে ডুবিয়া থাকিতেন।

যমুনার ধারে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা রাস্তার উপর সেবাশ্রমেরই লাগা একটী বড় ফুলের বাগিচা ছিল। মালীরা এই বাগিচার নানাবিধ ফুল বৃন্দাবনের মন্দিরে মন্দিরে বারমাস জোগাইত। এই বাগিচার পরেই যমুনার উপর আর একটী আশ্রম ছিল। ইহা আকবর বাদ্‌শাহের প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেনের গুরু হরিদাস গোস্বামীর সঙ্গীত সাধনার পীঠস্থান।

আশ্রমটী অনাড়ম্বর-শান্ত ও জনবিরল। কয়েকটী বড় গাছ শাখা বিস্তার করিয়া তথায় দণ্ডায়মান্। আর দুইটী কি তিনটী ছোট কুঠরী মাত্র ছিল। তাহার মধ্যে একটী গোস্বামিজীর সাধন পীঠ, অপর দুইটীতে সাধক ও সেবক সন্ন্যাসিগণ বাস করিতেন। তাঁহাদের সংখ্যা তিনটীর বেশী নহে। তাঁহারা আপন ভাবেই থাকিতেন, কাহারোও সঙ্গে বড় মিশিতেন না। সর্ব্বদাই আশ্রমটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিতাম, যাওয়া মাত্রই আশ্রমটীর মাহাত্ম্য অনুভব করা যাইত। প্রথমাবধি এই চারিশত বৎসরেও ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় নাই। ইহারা মূর্ত্তির উপাসক নহেন, শুধু সুরের সাধক। বিষয় বিরক্ত ত্যাগী সন্ন্যাসীর দ্বারা এই আশ্রমটী পরিচালিত বলিয়াই ঐ বিষয়ে তাঁহাদের সম্পূর্ণ উদাসীন ভাব মনে হইল।

প্রতি বৎসর ভাদ্র কি আশ্বিন মাসে রাধাষ্টমীর দিন গোস্বামিজীর জন্মতিথিতে বার্ষিক উৎসব সম্পাদিত হইয়া থাকে। তখন প্রশস্ত পরিষ্কার আঙ্গিনার উপর বড় আসন পাতা হয়। তাহাতে গৈরিক বস্ত্রধারী বিংশতাধিক সাধু তানপুরা হস্তে মুখোমুখী দুই লাইনে বসিয়া ধ্রুপদ সঙ্গীতের ও রাগ-রাগিনীর আলাপ বিস্তার করিয়া থাকেন। দুইটী সাধু দুই প্রান্তে বসিয়া মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজ ধ্বনি যোগে উহাতে এক অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের অবতারণা করেন। প্রতিবৎসর এইরূপ উৎসব ব্যাপার প্রত্যূষ হইতে সমস্তদিন ব্যাপী চলিয়া থাকে। এই উৎসবে সাধারণ লোকের সমাগম বেশী দেখি

নাই, পূজা বা ভোগরাগের কোন অনুষ্ঠানও দৃষ্ট হয় নাই। বোধ হইল সুর ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে ইহারা মনোনিবেশ করেন না। ভারতীয় এই অভিনব সম্প্রদায় অন্য কোথাও দেখি নাই। শুনিয়াছি এই সম্প্রদায়ের সাধুগণ ভারতের নানাস্থানে বাস করেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা অল্প। তাঁহারা অন্তর্মুখী সুর বা প্রণব সাধনের প্রণালীটী গোপন রাখেন বলিয়া তাঁহাদের বিষয় লোকে খুব কমই জানিতে পারে। প্রতি বৎসর গোস্বামিজীর এই উৎসব উপলক্ষে নানা স্থান হইতে উক্ত সম্প্রদায়ের সাধুগণ এখানে আসিয়া মিলিত হন এবং দুই তিনদিন থাকিয়া আপন আপন স্থানে চলিয়া যান। বৃন্দাবনের শতাধিক মন্দিরে আড়ম্বরের সহিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজানুষ্ঠানের মধ্যে এই অনাবিল স্থানটীর অনাড়ম্বর ভাব বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনন্তশায়ী বংশীধারী যে অনন্তভাবে—অনন্ত সুরে জীবের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন তাহা কে বুঝিবে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবারে বৃন্দাবনে আসিয়া মহেন্দ্রনাথ বেশী দূরে কোথাও বেড়াইতে যাইতেন না। নিকটবর্ত্তী দুইটী স্থানে যাইতেন, তাহার একটী উক্ত হরিদাস গোস্বামীর কুঞ্জ আর একটী সেবাশ্রমের অপর পার্শ্বে যমুনার ধারে বন-বিশেষ—নির্জ্জন ভূমি। এখানে যমুনার তীরে দূরে দূরে মাটীর নীচে গর্ত্তের মধ্যে বৈষ্ণব সাধুগণ রাত্রিদিন (বর্ষার চারিমাস ছাড়া) কঠোর তপস্যা ও জপে নিযুক্ত থাকিতেন।

এখানে বেড়াইবার কালে প্রায়ই কিষণজী মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহারা সেবাশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সহিত সাধুদের প্রসঙ্গে আলাপ করিতেন।

আমাদের সুখের দিনগুলি দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। পর বৎসর বর্ষার প্রথমেই আমি ম্যালেরিয়া জ্বরে পুনরায় আক্রান্ত হই। মাসাধিককাল জ্বরে ভুগিয়া আমি এমন রুগ্ন ও অশক্ত হইয়া পড়ি যে, চিকিৎসার্থে আমাকে তিনি কলিকাতায় লইয়া আসিবার সঙ্কল্প করেন। কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে বৃন্দাবনে একদিন সন্ধ্যার পরে আমার শারীরিক অবস্থা নিতান্তই সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। হস্ত-পদাদি ও ক্রমশঃ হিম হইতে থাকে। কর্ম্মীগণ বিমর্ষ ভাবে বসিয়া সেক-তাপ দিতেছিলেন, তাহাতে কিছুই হইতেছিল না। আমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলাম, মনে হইতেছিল বুঝি বা অন্তিম আগত। মহেন্দ্রনাথকে শেষ প্রণাম করিব বলিয়া ডাকিয়া পাঠাইলাম। তিনি আসিয়াই অবস্থা বুঝিলেন এবং নেপোলিয়ানের অস্তারলিজের যুদ্ধের বর্ণনা শুরু করিলেন। এমন ভাবে বিজয়ডঙ্কা বাজাইয়া পতাকাহস্তে নেপোলিয়ানকে সেতু পার করাইলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর গরম হইয়া উঠিল, আমি উত্তেজনায় উঠিয়া বসিলাম। এ ঘটনা আমার স্মৃতিপটে চির অঙ্কিত রহিয়াছে। আমাকে তিনি একাধিক বার এইভাবে রক্ষা করিয়াছেন।

আমাদের কলিকাতা আসিবার আয়োজন হইল। আশ্রমে কর্ম্মীদের ও বন্ধুগণের এক বিদায় ভাণ্ডারায় ভোজন হইল। আসিবার সময় বন্ধুরা প্রায় সকলেই উপস্থিত হইলেন। কেশবানন্দজী, কালিকানন্দজী ও কিষণজী আমার ডুলির সঙ্গে ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিলেন। গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বে বালকের মত কিষণজী আমাদের সঙ্গে কলিকাতায় যাইবেন বলিয়া আবদার ধরিলেন। আমি বলিলাম—"কিষণজী, আমি আপনাকে কোথায় সেখানে স্থান দিব ?" তিনি বলিলেন—"আমার ভাড়া লাগিবে না, থাকিবারও কোন কষ্ট হইবে না। গঙ্গার ধারে পড়িয়া থাকিব। আপনারা চলিয়া গেলে কেমন করিয়া থাকিব ?" আমরা চঞ্চল হইলাম। অনেক কষ্টে তাঁহাকে নিরস্ত করিলাম। ব্রহ্মচারী চিন্তাহরণ বৃন্দাবনে থাকিয়া গেলেন। আমাদের সঙ্গে শ্রীধরানন্দজী ( বুড়োবাবা ) ও চাটুজ্জে মহাশয় হাথরাস ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বে বুড়োবাবার চক্ষের জল মনে পড়ে। তিনি পরে অবসর লইয়া দীর্ঘকাল ৺কাশীবাস করেন ও শ্রীগুরুর পাদপদ্ম প্রাপ্ত হন।

১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে অর্থাৎ ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি কলিকাতায় আসিলাম। আমাকে আরোগ্যলাভ করিতে এবার অনেক সময় লাগিয়াছিল। এই সময় মহেন্দ্রনাথ যে কি উদ্বেগে দিন কাটাইতেছিলেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত। সর্ব্বদা আমার সংবাদ লইতেন ও মাঝে মাঝে আমাকে দেখিতে মহাপ্রাণ ৺হেমচন্দ্র নাগের বাড়ী

( নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটে ) আসিতেন এবং তুই একদিন বাসও করিতেন এবং আমাকে কত উৎসাহ দিয়া যাইতেন। ভক্ত নাগ পরিবারের অশেষ যত্ন ও সেবার গুণে আমি ক্রমশঃ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠি। ইঁহাদের ঋণ অপরিশোধনীয়।

আমার সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবার প্রায় এক বৎসর পরে নাহু মহারাজ অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় চলিয়া আসেন। তাঁহাকে আমি দেখিতে গেলাম। আমাকে দেখিয়াই তিনি উঠিয়া বসিলেন। বৃন্দাবনের নানা কথার পর কিষণজীর কথা উঠিল। তিনি বলিলেন—"আপনার বন্ধু আর এ জগতে নাই। কোন্ জগতে আছেন বলুন দেখি ?" আবেগ-ভরে গদগদ স্বরে বলিতে লাগিলেন—"কিষণজীর মহাপ্রস্থান এক অপূর্ব্ব কাহিনী! আপনারা চলিয়া আসিলেন—তিনিও বৃন্দাবন ছাড়িয়া জাবট গ্রামে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। তথায় মাধুকরী করিয়া কঠোর জীবন যাপন করেন এবং পেটের পীড়ায় অসুস্থ হন। ক্রমে তিনি অচল হইয়া পড়িলে গ্রামবাসিগণকে ডাকিয়া বৃন্দাবনে সেবাশ্রমে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতে বলেন। তাহারা ডুলিতে করিয়া কিষণজীকে সেবাশ্রমে দিয়া যায়। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমি চিন্তিত হইলাম। ১১ দিন চিকিৎসার পরেও বিশেষ কোন ফল দেখা গেল না। পরদিন তিনি ঔষধ ও পথ্য ত্যাগ করিয়া সারাদিন চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। বৈকালে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং আমার নিকট মাংস প্রসাদ চাহিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ মাংস

রন্ধন করিয়া আনিবার ব্যবস্থা করিলাম। রাত্রিতে এক বাটি মাংস লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে খাইয়া প্রসাদ করিয়া দিতে বলিলেন। আমি তাঁহার সম্মুখে তাহাই করিলাম। তিনি তৎপরে ঐ বাটী অঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শ করিয়া আপন মস্তকে স্পর্শ করিলেন এবং বলিলেন, 'পূরণ, আনন্দ, মহারাজ, পায় লাগি' এই বলিয়া করজোড়ে সকলকে প্রণাম করিলেন। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিষণজী! এ কি রকম হইল? আপনি পরম বৈষ্ণব, মাছ, মাংস কখনও স্পর্শ করেন নাই, আজ শেষ সময় এ রকম করিলেন কেন?' তিনি তখন ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, 'আমার কাল পূর্ণ, দেহান্ত হয় না বলিয়া আজ সারাদিন চিন্তা করিলাম, এর কারণ কি? পরে বুঝিলাম কে বাধা দিতেছে। চিরদিন মাছ মাংস ঘৃণার চোখে দেখিয়াছি। আমার এই একটী জিনিষের উপর অপবিত্র বোধ এখনও যায় নাই। ইহাও এখন পবিত্র হইল। আজ সকল বস্তুই পবিত্র দেখিতেছি। আজ আর আমার নিকট অপবিত্র বলিয়া কেহ নাই, সকলই কৃষ্ণময়! মহারাজ, এখন বিদায়, পায় লাগি মহারাজ।' এই বলিয়া নীরব হইলেন আর কথা বলিলেন না। রাত্রির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। এইভাবে ব্রজমণ্ডলের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রেমসিন্ধু সলিলে চিরতরে ডুবিয়া গেল!"

এই বলিতে বলিতে নাহু মহারাজের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। বলিলেন, "কিষণজী

কি রকম প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্বটুকু আমাদের শিক্ষা দিয়া গেলেন।”

নাহু মহারাজের বর্ণিত কিষণজীর মহাপ্রয়াণের কাহিনী মহেন্দ্রনাথকে আসিয়া বলিলাম, তিনি স্থির হইয়া গেলেন। পরে বলিলেন, “এরূপ দৃষ্টান্ত পুঁথি পুরাণেও নাই।” তাঁহার “সাধু চতুষ্টয়” গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। তিনিই কিষণজীকে চিনিয়াছিলেন এবং আমাদিগকে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত করিয়া ছিলেন। নাহু মহারাজের কথার আবেগ দেখিয়া তখনই বুঝিলাম তিনিও আর বেশী দিন নাই। অল্পদিন পরে শ্রীবৃন্দাবন-ধাম আপন কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া তিনিও দেহ ত্যাগ করেন। বীর ভক্ত কিষণজী ও কর্ম্মবীর নাহু মহারাজ আজ প্রেমময় রাজ্যের অধিবাসী। তাঁহাদের অমৃতোপম জীবনস্মৃতি লইয়া এই স্তবক সমাপ্ত হইল।*

---

* ‘সাধুচতুষ্টয়’ লেখার পরে গ্রন্থকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ কিষণজী সম্বন্ধে এবং বৃন্দাবন সেবাশ্রম ও নাহু মহারাজ প্রভৃতি কর্ম্মিগণের বিষয় বিস্তারিত প্রবন্ধাকারে লিখিতে আমাকে অনেকবার বলিয়াছিলেন। অনেক কিছু লেখারও ছিল—কিন্তু নানা কারণে আমার লেখা হইয়া উঠে নাই। আজ তাঁহার আদেশ স্মরণ করিয়া প্রসঙ্গ ক্রমে কিষণজী, বৃন্দাবন সেবাশ্রম ও নাহু মহারাজের বিষয় যেটুকু আমার এখনও মনে আছে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

—০—

শ্রী-মহেন্দ্রনাথ দত্ত

বয়স ৬০ বৎসর

## সপ্তম স্তবক

( বিক্রমপুর-কামারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, ফয়জাবাদ, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, বাঁকুড়া, বৰ্দ্ধমান, দার্শনিক মতবাদ ও বাংলা গ্রন্থ )

গুরুস্থানের জন্য কতিপয় গ্রন্থ সঙ্কলন ও প্রচার এবং স্বগ্রামের আহ্বানে, তথায় সেবাশ্রম, দাতব্য ঔষধালয় এবং বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল মহেন্দ্রনাথের নিয়ত সঙ্গলাভে বঞ্চিত হই। মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছি। তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই শেষ স্তবকে প্রদত্ত হইল :—

১। মহেন্দ্রনাথের শরীর অসুস্থ হওয়ায় সম্ভবতঃ ১৯২৩ সালের গ্রীষ্মকালে তাঁহাকে লইয়া পদ্মার পারে বিক্রমপুর-কামারগাঁ গ্রামের ৺শশীভূষণ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে একমাস কাল অবস্থান করি। বিশাল পদ্মার দৃশ্য ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে এবং সুখাদ্য গ্রহণের ফলে অল্প দিনেই তাঁহার শরীরের উন্নতি হইল। আমাদের ট্রাঙ্কের মধ্যে বস্ত্রাদি ও মহেন্দ্রনাথের গ্রন্থের হস্ত লিখিত খাতাগুলি ছিল। এক রাত্রিতে চোর আসিয়া ট্রাঙ্ক লইয়া যায়, পরের দিন মাঠের মাঝে ভাঙ্গা ট্রাঙ্ক মধ্যে অমূল্য রত্ন খাতাগুলি পাওয়া গেল। বস্ত্রাদি পাওয়া গেল না। রাত্রিতে এই সংবাদ শুনিয়া মহেন্দ্রনাথ নির্ব্বিকার চিত্তে আমাকে বলিয়াছিলেন—"ও জিনিষ বিনষ্ট হইবার নহে, নিশ্চিন্ত থাক।"

এই সময় ব্রহ্মচারি-চিন্তাহরণ তথায় আসিয়া মিলিত হন। মহেন্দ্রনাথকে দর্শন করিতে নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোক সর্ব্বদা আসিত। তিনি তাঁহাদিগকে যথাযথ মর্য্যাদাদানে ও মিষ্টালাপে তুষ্ট করিয়া বিদায় দিতেন। অগাধ পাণ্ডিত্য লইয়া অজ্ঞপ্রায় গ্রামবাসীদের সহিত তাহাদেরই মত হইয়া মহেন্দ্রনাথ যে আলাপ করিতেন তাহা একটী দর্শনীয় ব্যাপার ছিল। একমাসকাল কামারগাঁ অবস্থানের পর নারায়ণগঞ্জে ৺নিবারণ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ী গমন করি। তথায় তিন দিন থাকিয়া ঢাকা মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ডাঃ ৺নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের বাড়ী যাই। একদিন পরে ময়মনসিংহ-সিরাজগঞ্জ পথে কলিকাতা চলিয়া আসি। কিছুদিন পরে মহেন্দ্রনাথ কাশী অদ্বৈতাশ্রমে যাইয়া বাস করেন। আমি কলিকাতায় রহিয়া যাই।

২। ঐ বৎসরেই ( ১৯২৩ সালের শেষে ) শীতের প্রথমে আমরা উভয়ে ফয়জাবাদে বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (বর্ত্তমানে স্কুল ইন্সপেক্টর, বুলন্দসহর) মহাশয়ের বাড়ী মাসাধিক কাল একসঙ্গে বাস করি। সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে আমি কাশী কুরুক্ষেত্র, জ্বালামুখী, হরিদ্বার, কানপুর ও এলাহাবাদ হইয়া ফয়জাবাদে যাই। মহেন্দ্রনাথ একমাস পরে কাশী হইতে ফয়জাবাদে আসেন।

রামসীতার দেশের জাগ্রত ভাব আমাদের বিশেষ আকর্ষণের বিষয় হইয়াছিল। প্রত্যূষে উঠিয়া সরযূর ক্ষীণ ধারায় স্নান, শিব মন্দিরে গমন, এখানে সেখানে রামাউৎ সাধুগণের কুটীরে

রামসীতার পূজা ও আরতি দর্শন এবং ভজন গান শ্রবণ আমাদের মনে রামায়ণে বর্ণিত চিত্রসকল জাগাইয়া তুলিত। বৈকালে কখনও পায়ে হাঁটিয়া, কখনও বা একায় চড়িয়া বেড়াইতে যাইতাম। অযোধ্যার বেগমদের ভগ্ন পতিত মহল ও মাঠ, নূতন প্রতিষ্ঠিত কলেজ, মতিমঞ্জিল, গোপ্তার ঘাট (যেখানে সরযূজলে রামচন্দ্র দেহ রক্ষা করেন) প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে যাইতাম। মহেন্দ্রনাথ পুরাতন কাহিনী সকল আলোচনা করিতেন। সন্ধ্যার সময় আমরা ভাঙ্গী (মেথর) পাড়ায় যাইতাম।

বিদ্যোৎসাহী উপেন্দ্রবাবুর আগ্রহে সেখানে এক নৈশ পাঠশালা স্থাপিত হয়। ভাঙ্গী যুবক ও বালকগণ উৎসাহ সহকারে পড়িতে আসিত, স্তব পাঠ করিত, মহাপুরুষদের জীবন কথা মনোযোগের সহিত শুনিত, বেশভূষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া পবিত্রভাবেই আসিত। অনেকে পড়িতে, লিখিতে ও গণনা করিতে শিখিয়াছিল। দুই এক জন ছাত্র বিশেষ অগ্রসর হইলে, তাহারা প্রথম শ্রেণীতে পাঠ দিতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা খুব সভ্য ও শান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে আত্মসম্মান জ্ঞান জাগিতে দেখিয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ হইল। এই অস্পৃশ্য নীচ জাতির সংস্পর্শে যে অকৃত্রিম ভালবাসার আস্বাদন পাইয়াছিলাম তাহা বুঝাইবার নহে। তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার তুলনা হয় না। এই পাঠশালাটি সরকারী সাহায্য পাইয়া পরে উন্নতি লাভ

করিয়াছিল শুনিয়াছি। এ সমুদয় কর্য্যে মহেন্দ্রনাথ বিশেষ উৎসাহ দিতেন।

একদিন আমরা দুইজনে অতি প্রত্যুষে এক্কা করিয়া পাঁচ মাইল দূরে অযোধ্যা দর্শন করিতে যাই। তথায় যাইয়া সরযূতে স্নান সমাপন করিয়া রামসীতা ও হনুমানজীর মন্দিরে দেবতা দর্শন করি। সেদিন কি এক পার্ব্বণ ছিল, যাত্রীর ভীড় বেশী দেখিলাম। আমরা বাজার ছাড়িয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বাল্মিকীর "আয়তা দশচ দ্বেচ যোজনানি মহাপুরী। শ্রীমতী ত্রিণিবিস্তীর্ণা সুবিভক্তা মহাপথা।"—বার যোজন লম্বা, তিন যোজন চওড়া শ্রীমতী সে অযোধ্যাপুরীর কিছুই আর নাই। পুরাতন সহরটী জনবিরল—কোন শ্রীই দেখিলাম না। রামচন্দ্রের জন্মস্থানের অবস্থা দেখিয়া বেদনা পাইলাম। তথায় একটি মসজিদ জোর করিয়া গাড়িয়া বসিয়াছে। পথ চলিতে চলিতে একটী বড় রকমের রামসীতার মন্দিরের পাশে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে তখনও রৌশনচৌকি বাজিতেছিল। শ্রোতার অভাব, আমরা রাস্তায় দাঁড়াইয়াছি দেখিয়া সানাইবাদক ভিতরে যাইতে ইঙ্গিত করিল। আমরা মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—রোয়াকে বসিয়া এক প্রৌঢ় ব্যক্তি সানাই বাজাইতেছে আর একটি বালক তাল ঠুকিতেছে। আমাদের মত দুর্ল্লভ শ্রোতা পাইয়া সে প্রাণ খুলিয়া নানা রাগরাগিণীর আলাপ শুরু করিল। আমরাও শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম। অনেকক্ষণ কাটিয়া

গেলে বাদককে খুব তারিফ করিয়া চলিয়া আসিলাম। "এইরূপ মনোহরণকারী সানাই বাজনা আর কোথাও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না"—মহেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় টাঙ্গায় চড়িয়া আমরা ফয়জাবাদে উপেন্দ্রবাবুর বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

অযোধ্যায় সরল গ্রাম্য লোকদের দেবতার উপর সর্ব্ববিষয়ে নির্ভরের ভাব আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছিল। কথায় কথায় 'জান্‌কী মাই কি', 'সরযূ মাই কি ইচ্ছা' বলিয়া দোহাই দিত।

এখানে একদিনকার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। একবার সরযূর পথে একদল অযোধ্যা-বাসিনীর যাত্রা দেখিলাম। গৃহস্থের কোন উৎসব উপলক্ষে মাল্য গলে এক পূর্ণকুম্ভার অগ্রে ও পশ্চাতে অবগুণ্ঠনাবৃতা রমণীগণ গান ও মৃদু মধুর নাচ করিতে করিতে গৃহে চলিয়াছে—গানের প্রথমটুকু মনে আছে ঃ—

"সরয্‌্কা তীরে কুমার শ্যামল ঠারী,
শ্যামল ঠারীরে, কুমার শ্যামল ঠারী,
জল ভরণে কো গ্যয়া—আচক্ মোহন
মিল্ গ্যয়ী তু নগর পরা॥"...*

অর্থ ঃ—দুর্ব্বাদল শ্যামল রামচন্দ্র সরযূতীরে দাঁড়াইয়া। আমি জল ভরিতে যাইয়া তাঁহার মোহন মূরতি চকিতে দেখিলাম। তিনিও আমাকে ঘরের বাহিরে দেখিলেন—কি লজ্জার কথা!

*এই গানটি অন্যত্রও শুনিয়াছি।

আহ্লাদে ও লজ্জা সরমে ঘোমটা টানা, জিভ্ কাটা, মাথা হেঁট করার ভঙ্গী সহকারে গান ও নাচ রাজা রামচন্দ্রের প্রত্যক্ষ দর্শন যে মিলেছে তাহা বুঝাইয়া দিল। অতীতের সেই পুরাণ-বর্ণিত নরদেবতাকে সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানে আমাদের সম্মুখে আনয়ন করিল। মনের অতীত ভাব ঘুচিয়া গেল! ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিত্যকার ঘরের লোক, অযোধ্যাবাসীদের নিকট তেমনই শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার প্রত্যক্ষ চির অধিষ্ঠিত রাজা! পুরাতন কেহই নহেন। অন্যত্র এক যুগ তপস্যাতেও বুঝি বিশ্বপতিকে এত সন্নিকটে অনুভব করা যায় না। রাজা মহারাজ যথার্থই বলিয়াছিলেন—স্থান মাহাত্ম্যে পুরাতন নূতন হয়, নিদ্রিত জাগ্রত হয়। তাঁহাকে প্রণাম।

আমরা অযোধ্যার আনন্দ সম্পদ মাথায় করিয়া এলাহাবাদে ভারতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক ৺রাজা রাওর বাড়ী যাইয়া উঠিলাম। আমি মাসাধিককাল তথায় থাকিয়া বিশেষ প্রয়োজনে কলিকাতায় চলিয়া আসি। মহেন্দ্রনাথ পরে কনখল সেবাশ্রমে চলিয়া যান এবং প্রায় দেড় বৎসর তথায় বাস করেন। এবারে সাধু মথুরা দাসের সহিত মহেন্দ্রনাথের মিলন হয়। মহেন্দ্রনাথ তাঁহার "সাধু চতুষ্টয়" গ্রন্থে মথুরাদাসের ব্রহ্মানুভূতির অতি উপাদেয় বর্ণনা দিয়াছেন!

৩। ইং ১৯২৮ সালের মার্চ্চ মাসে মহেন্দ্রনাথকে ৺অহীন্দ্রভূষণ ঘোষ, বাঁকুড়ার উকিল মহাশয়ের বাড়ী রাখিয়া আসি। তথায় তিনি পাঁচ মাস অবস্থানের পর হঠাৎ কলিকাতা

চলিয়া আসেন। অল্পদিন পূর্ব্বে ৺হেমচন্দ্র নাগ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহাকে বিশেষ চঞ্চল হইতে দেখিয়াছিলাম।

৪। আর একবার ১৯৩২ সালে পূজার পরে বর্দ্ধমান হইয়া দামোদরের অপর পারে শাঁখারী গ্রামে ডাঃ শ্রীঅধীরশরণ স্থাপিত রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যাই। সেখানে তখন স্বামী শ্রীধরানন্দ (বৃন্দাবনের বুড়োবাবা) অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে মহেন্দ্রনাথকে রাখিয়া চার পাঁচ দিন পরে আমি কলিকাতা চলিয়া আসি।

শাঁখারী আশ্রম গ্রামের এক প্রান্তে বড় রাস্তার ধারে মাঠের উপর অবস্থিত। আশ্রমগৃহ (অস্থায়ীভাবে দুইখানা চালা) উঠিয়াছে, মন্দির প্রস্তুত হইবার আয়োজন হইতেছে দেখিলাম। আউট-ডোরে ডাক্তারখানাটী প্রস্তুত হইয়াছে। তথায় রোগী ও লোকসমাগম সর্ব্বক্ষণই লাগিয়াছিল। একমাত্র শ্রীঅধীর ডাক্তারের কর্ম্মশক্তি ও প্রতিপত্তির ফলে এই আশ্রম গড়িয়া উঠিতেছিল। গ্রামটীতে বহু বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বসতি। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের মাতুলালয়ে বড় দোতলা বাড়ীতে এক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত ছিল। গ্রামের নানা সুদৃশ্যের মধ্যে আশ্রমের অদূরে শত শত প্রস্ফুটিত শ্বেত শতদলপূর্ণ একটী সরোবরের দৃশ্য এখনও নয়ন পথে রহিয়াছে।

আমরা শাঁখারী যাইবার পথে বর্দ্ধমানের তদানিন্তন

মুন্সেফ (পরে ডিঃ জজ) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দে মহাশয়ের বাড়ী দুইদিন অবস্থান করি। পরদিন বৈকালে গরুর গাড়ী করিয়া শাঁখারী রওনা হই। দামোদর নদী তখন শুষ্ক প্রায়, তাহা আমরা গাড়ীতে বসিয়াই পার হইলাম, নদীগর্ভ হইতে খাড়া উঁচু পাড়ে উঠিবার জন্য ক্রমোন্নত ঢালু রাস্তা সম্প্রতি কাটা হইয়াছিল। তাহা খুব প্রশস্তনহে। ঐ ঢালু নরম মাটীর উপর দিয়া গরুর গাড়ী মোড় দিয়া যেমন সমতল ভূমিতে উঠিয়া পড়িবে, অমনি গাড়ী হঠাৎ গরু দুইটীর সম্পর্ক ত্যাগ করিল এবং সোজা পিছনে সরিয়া একতলা সমান নীচে বালির উপর যাইয়া চাকা দুইটী বুকে করিয়া খাড়া দাঁড়াইল! পিছনে বিছানা, সম্মুখে ট্রাঙ্ক, আমরা গাড়ীর মধ্য স্থলে যেমন বসিয়াছিলাম, তেমনই বসিয়া রহিলাম। মুহুর্ত্ত মধ্যে এই ব্যাপার ঘটিয়া গেল। আমরা উভয়ে বহু সঙ্কটপূর্ণ স্থানে একসঙ্গে বেড়াইয়াছি এমনটী কোথায়ও ঘটে নাই। কে যেন অলক্ষিতে সর্ব্বক্ষণ সঙ্গে থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিত। মহেন্দ্রনাথ সর্ব্বস্থলেই সঙ্কট কালে নির্ব্বিকার—স্থির!

শাঁখারীতে মাসাধিক কাল অবস্থানের পরে কলিকাতা চলিয়া আসেন। ইহার পরে মহেন্দ্রনাথ আর কলিকাতার বাহিরে কোথাও গমন করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। এই সময় হইতে তাঁর বাংলা লেখার কার্য্য দ্রুত চলিতে থাকে। পদ্য ও গদ্য উভয়বিধ গ্রন্থই লেখা হয়। তাহা পরে ক্রমে

মুদ্রিত আকারে বাহির হয় এবং পাঠকবর্গের চিত্তাকর্ষণ করে। এই সময় হইতে তৃষিত নরনারীর বিশেষ সমাগম আরম্ভ হয়। তাঁহার দ্বার তাঁহাদের জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। সকলেই মনোবাসনা জানাইয়া শান্তি পায় ও অভয়লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

মহেন্দ্রনাথের Energy, Mind ও Metaphysics প্রভৃতি কতিপয় দার্শনিক গ্রন্থ মধ্যে ভারতীয় সনাতন ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাচীন 'স্পন্দনবাদ'* এবং 'স্ফোটবাদ' সাহায্যে ব্যখ্যাত হইয়াছে। এই সমুদয় তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা ও উপলব্ধির ফলস্বরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে, এই সকল গ্রন্থে তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই অখণ্ড বিশ্বব্যাপার মূল সূক্ষ্মকারণ চৈতন্যাশ্রিত শক্তি হইতে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও তদতি-

---

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নাপো মাতরিশ্বা দধাতি। ৪
তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫
—ঈশোপনিষৎ

অর্থ—তিনি গতিশূন্য আবার ইন্দ্রিয় এবং মন হইতেও গতিশীল। তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া দ্রুতগামী।

তিনি (এক অবস্থায়) স্পন্দিত হন, আবার (এক অবস্থায়) স্পন্দিত হনও না। তিনি সকলের অন্তরে এবং সকলের বাহিরে—ইত্যাদি।

রিক্ত স্থূল পদার্থ পর্য্যন্ত একই নিয়ত স্পন্দন ধারায় প্রসৃত। অতীন্দ্রিয় অতি সূক্ষ্মতম এবং দৃশ্যমান্ ও তদতিরিক্ত স্থূলতম পদার্থ একই স্পন্দনের অবস্থান্তর মাত্র। সর্ব্বত্রই এক শক্তির নিরবচ্ছিন্ন স্পন্দন খেলা চলিয়াছে। কোন পদার্থই বিচ্ছিন্ন নহে, সকলের মধ্যেই পূর্ব্বাপর সংশ্লিষ্ট স্পন্দন যোগ রহিয়াছে, কেন্দ্রীভূত শক্তিগুলি নানা ধারায় এক কেন্দ্র হইতে বহু কেন্দ্রে জালের মত বিস্তার লাভ করিয়া অনন্ত প্রসারী হইয়াছে। অতএব প্রতি বস্তুরই অনন্ত সূক্ষ্ম ও স্থূল অবস্থা আছে। স্থূল পদার্থ বুঝিতে হইলে তাহার পশ্চাতের সূক্ষ্ম অবস্থা বা অধিষ্ঠানের জ্ঞান প্রয়োজন। যিনি যত পদার্থের সূক্ষ্ম তরঙ্গের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি ততবড় পদার্থবিদ্, জ্ঞানী বা বৈজ্ঞানিক। আবার সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্ ( যোগীগণ ) সূক্ষ্মের স্থূলরূপ দানে সমর্থ। অচেতন বলিয়া কিছুই নাই, সকলেই এক চেতনশক্তির সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদে রূপান্তর মাত্র। অতএব জীব ও অজীব বিভাগ একই নিয়মাধীন।

জীবের পশ্চাতে যে সূক্ষ্ম স্পন্দন রহিয়াছে তাহার জ্ঞান ইতর জীবের নাই, মনুষ্যের আছে। মনুষ্য আপন সূক্ষ্ম স্পন্দন অবস্থার জ্ঞান লাভের জন্য অনুসন্ধান করিয়াছে। তাহার নাম অধ্যাত্মসাধনা, অন্তর্দৃষ্টি বা যোগ। আমাদের স্থূল স্নায়বিক দেহের পশ্চাতে সূক্ষ্ম স্নায়বিক দেহ। তাহার পশ্চাতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম ক্রমে মূল চেতন শক্তি পর্য্যন্ত অবস্থা-পর্য্যায় বিদ্যমান্। ইহার কথঞ্চিৎ তত্ত্বজ্ঞান মানুষ

লাভ করিয়াছে এবং আপন অস্তিত্ব বোধলাভের দ্বারা তাহার জ্ঞান অন্বেষণ তৃপ্ত হইয়াছে।

গ্রন্থকার নির্গুণ ব্রহ্ম ও মায়াবাদ বা জগৎ মিথ্যা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে তরঙ্গরাজির ব্যাপার চিরন্তন এবং তাহার পশ্চাতে যে মূল সর্ব্বাধিষ্ঠান তাহা বাক্যমনের অগোচর—এক বিরাট অনাদি অখণ্ড চেতন সত্ত্বা।

"নাহি তথা কালের গমন,
নাহি হিল্লোল কল্লোল,
নাহি নাহি ফুরাইল বাক্
বর্ত্তমান বিরাজিত"·········

( বিল্বমঙ্গল )

"কত শত বিশ্ব ভাসে অসীম অনন্ত স্থানে
উজ্জ্বল উজ্জ্বলতর ক্রমে, কে করে গণন ?

*    *    *

ভিন্ন লোক কিন্তু এক নিয়ম অধীন !
বিচিত্র এ নিয়ম, ফোটে আলো
আঁধার হইতে, অচেতন, সচেতন ক্রমে,
স্থূল শূণ্যেতে মিশায়, শূণ্য পুনঃ স্থূল প্রসবিণী।
মৃত সঞ্জীবিত জীবন মরণ করে গ্রাস,
মহাশক্তি ভাঙ্গে গড়ে নিয়তই শক্তি বহে—
হ্রাস-বৃদ্ধিহীন" ( বুদ্ধদেব )।

এই সমুদয় গ্রন্থকারের অতি প্রিয় আবৃত্তি।

ব্রহ্মানুভূতি বাখ্যাকালে মহেন্দ্রনাথ ইংরাজ কবিগণের অনুভূতির বাণী স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

1. In such high hour of visitation from
the living God, thought there is none.
In exaltation it expires. He seeks
no praise ; he offers no prayer.

No more is there I or you, myself or thyself, or the outside world, but one all perv ading one—This is called the Happy Vision !

ভাবার্থ :—জীবন্ত ঈশ্বর দর্শনের সে উচ্চ অবস্থায় ভাব ভাষা থাকে না। গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়। (উপাস্য) ভগবান্ স্তব-স্তুতি চাহেন না। (উপাসক) ভক্তপ্রাণে প্রার্থনাও জাগে না। তখন আমি-তুমি, আমার-তোমার বা বর্হির্জগৎ আর নাই—আছে মাত্র সর্ব্বব্যাপী এক সত্বার অনুভব—ইহাই হইল সচ্চিদানন্দ দর্শন।

2. What next befell me then and there
I never knew.
First came the loss of light and of air,
then of darkness too !

ভাবার্থ :—সে অবস্থায় কি ঘটিল বুঝিলাম না। প্রথমে আলো নিভিয়া গেল, নিঃশ্বাস বায়ু রুদ্ধ হইল, পরে অন্ধকারও রহিল না।

3. We leave all morality behind.
as we reach Divinity.

ভাবার্থ :—দেবত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে পূর্ব্ব নীতিজ্ঞান অচল হয়।

তাঁহার মতে নিত্যের ন্যায় লীলাও সত্য, মিথ্যা আপেক্ষিক পরিবর্ত্তন, অবস্থান্তর বা রূপান্তর মাত্র।

স্থূল ও সূক্ষ্ম তরঙ্গধারা মধ্যে কয়েকটী নিয়মের কথাও বলা হইয়াছে। অনুলোমক্রমে (Introspective process) মন স্থূল হইতে যত সূক্ষ্মের দিকে আরোহণ করে ততই স্পন্দন দ্রুততর হইতে থাকে। সেই পরিমাণে চৈতন্য শক্তিরও আধিক্য ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে দ্যোতনা বা আভাও তাদৃশরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হয় এবং নিজের ব্যাপকতা বোধ বৃদ্ধি পায়। দেশও কালের ব্যবধান ক্রমে তিরোহিত হয়।

মন স্থূল হইতে উর্দ্ধে আরোহণ কালে জটিল স্নায়ুজাল পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ অল্প সরল স্নায়ুপথ অবলম্বনে বহিঃকেন্দ্র হইতে অন্তঃকেন্দ্রে (Point of Polarisation) গমন করিতে থাকে। এই পথে আরোহণ ক্রমে ক্লেশ শূন্য হয় এবং চাঞ্চল্য মৃদু ভাব ধারণ করে। পরিশেষে মন একাধিক স্নায়ু পরিত্যাগ করিয়া (রক্তবর্ণাদিরূপ) আরোহণ ক্রমে এক অতি শুভ্র সূক্ষ্ম স্নায়ু অবলম্বনে স্থিরতা প্রাপ্ত হয়—"বর্ত্তমান বিরাজিত"—আপন অস্তিত্ববোধ মাত্রে বা সৎস্বরূপে স্থিত হয়। ইহাই অনন্ত প্রসারি আত্মজ্ঞান লাভের প্রথম সোপান। বন্ধন ও মুক্তি বোধ এই আত্মজ্ঞান লাভের অভাব ও ভাব জনিত। আত্মজ্ঞান লাভেই মানুষের দুঃখনিবৃত্তি ঘটে ও সর্ব্বাধিক আনন্দের আভাব প্রাপ্ত হয়। ইহা নিষ্ক্রিয়তার বিপরীত, মহাশক্তিশালী ও কল্যাণাত্মক অবস্থা।

অতঃপর আধার অনুরূপ অপরে এই আত্মজ্ঞান বা শুদ্ধা ভক্তি এবং অধ্যাত্ম শক্তির বিকাশ ঘটিতে থাকে, অর্থাৎ বিলোমক্রমে তাহা আবার জগতের কল্যাণের জন্য প্রকাশ পায়। উন্নত কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি নিম্নকেন্দ্রস্থিত ব্যক্তিগণের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করেন এবং তাহাদের আশ্রয় স্বরূপ হন। নিজ স্পন্দনানুরূপ অপরেও স্পন্দন জাগ্রত বা আরোপ করিতে সক্ষম হন। (Similar vibration catches similar vibration) ইহাকেই শক্তি সঞ্চার বলে। ইহাই হইল অধ্যাত্ম-জগতে মানবের উন্নতির পরিমাপক।—এইভাবে গ্রন্থকার তাঁহার দার্শনিক তত্ত্বের এক নবরূপ দান করিয়াছেন।

তাঁহার গ্রন্থে ভারতীয় স্ফোটবাদও নিজভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম সংক্ষেপে এই রূপ—পশ্বাদির ভাষা ধ্বন্যাত্মক। তাহার বিকাশ নাই—চিরদিনই একরূপ। মানুষের ভাষা বর্ণাত্মক, তাহার বিকাশ অসীম। মুখে উচ্চারিত শব্দ বা ভাষা তরঙ্গের (বৈখরীর) পশ্চাতে অস্ফুট শব্দ বা ভাষা তরঙ্গ (মধ্যমা) রহিয়াছে। তাহার পশ্চাতে ব্যক্তমুখী ভাব তরঙ্গ (পশ্যন্তি); তাহাই স্থূলতর তরঙ্গক্রমে অতিসূক্ষ্ম অব্যক্ত (পরা) অবস্থা হইতে উত্থিত হইয়া তাহাতেই আবার লয় পাইতেছে।* এই মূল সূত্রটি এস্থলে সর্ব্বক্ষণ স্মরণ যোগ্য।

* "যস্মিন্‌ প্রলীয়তে শব্দঃ তৎ পদং ব্রহ্ম গীয়তে।" যাহাতে শব্দ সকল লীন হইয়া যায় তাহাই ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয়।

আবার বর্ণ যোজনার দ্বারা শব্দ প্রস্তুত হয়; শব্দ যোজনার দ্বারা বাক্য, বাক্য যোজনার দ্বারা ভাষা; ভাষা দ্বারা ভাব পুষ্ট ও প্রকাশিত হয়। তদ্বারা একের ভাব অপরে সঞ্চারিত হয়। ইহাকেই বাক্যালাপ বলা হয়; ইহাও সূক্ষ্ম স্পন্দন শক্তিরই খেলা। গঙ্গাগর্ভ স্মরণ ব্যতীত যেমন জলপ্রবাহের কল্পনা অসম্ভব, তদ্রূপ এই বর্ণ যোজনা হইতে ভাব সঞ্চার পর্য্যন্ত সমস্ত তরঙ্গ ব্যাপারের অন্তস্তলে পরস্পরের যোজক এবং অর্থ বা তাৎপর্য্য বোধক এক অখণ্ড চৈতন্য সত্ত্বা স্বীকার করিতেই হয়। অন্যথা মানসিক ভাব বা চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন তরঙ্গরূপে অনধিষ্ঠিত বা আধারশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পড়ে এবং শব্দ, ভাষা ও ভাব বা সংবদ্ধজ্ঞান উৎপাদন মোটেই সম্ভব হয় না। বর্ণ ও শব্দ তরঙ্গের অন্তস্তলস্থিত এই যে প্রতিবোধবেত্তা অখণ্ড সত্ত্বা, ইহাই হইল ব্রহ্মসত্ত্বা। এইরূপ ব্যাখ্যাকেই ভারতীয় মনীষী ও ভাষাবিদ্‌গণ স্ফোটবাদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। স্ফোট অর্থে বোধক, অর্থাৎ প্রতি শব্দ জ্ঞানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের অনুভব সহ শেষ বর্ণের যোগে স্মৃতির অতিরিক্ত যে বস্তুটী অখণ্ড শব্দ ও তাহার অর্থবোধ জন্মায় তাহাকে বুঝায়। ইহা বাক্য-প্রতিপত্তির কারণরূপ বক্তা ও শ্রোতার অন্তরস্থ অখণ্ড চৈতন্য-সত্ত্বা।* সাধনা দ্বারা তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভাষা, ব্যাকরণ এবং শব্দশক্তির আলোচনার ফলে সাধক এই অখণ্ড

---

* "নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽহমাত্মা"—হস্তামলক।
অর্থ :—নিত্য উপলব্ধি স্বরূপ আমিই আত্মা।

চৈতন্যসত্তার অনুভবের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন। শব্দ-শাস্ত্রালোচনাই সাধনা—বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জ্জনের ফলে মানুষ অতিমানবত্ব বা দেবত্ব লাভ করিতে পারে। তখন তিনি বিশ্বময় শব্দ তরঙ্গের পশ্চাতে অখণ্ড, অব্যক্ত, নিত্য বস্তু-সত্তা বা আত্ম-দর্শনে সক্ষম হন। একস্থলে দর্শন লাভ হইলে সর্ব্বত্রই দর্শন হয়, অথবা তিনি সর্ব্বপারদর্শী ব্রহ্মবিৎ হন। ইহাকেই শব্দ ও ভাষা আলোচনা বা সাধনার ফল বলা হয়।†

মহেন্দ্রনাথের নিজস্বভাবে স্পন্দন ও স্ফোটবাদের আলোচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে এবং বিজাতীয় ভাষায় প্রাচীন ভারতীয় মতবাদ পরিবেশনের দ্বারা পাণ্ডিত্যও কম দেখান হয় নাই। এই সমুদয় গ্রন্থ উত্তমরূপে সম্পাদিত এবং পাশ্চাত্য দেশে প্রচারিত হইলে সমাদর লাভ করিত সন্দেহ নাই।§

---

† "প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্" ॥

কেনোপনিষৎ ২।৪

অর্থ—প্রতি বস্তু বা পদ-পদার্থ জ্ঞানের সাক্ষীরূপে যখন প্রত্যগাত্মা বা ব্রহ্ম বিদিত হন, তখনই প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। এই আত্মানুসন্ধানরূপ নিষ্ঠা দ্বারা অমৃতলাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় এবং তৎপরে সর্বজ্ঞান সাক্ষী আত্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়।

§ শ্রীমহেন্দ্রনাথ তাঁহার দার্শনিক মতবাদ বাংলা ভাষায় আলোচনা করিবার কথা আমাকে একাধিকবার বলিয়াছেন। নানা কারণে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহারই অভিপ্রায় পূরণার্থে এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে সামান্যমাত্র বলা হইল। যোগ্য ব্যক্তিদ্বারা এই বিষয়ের আলোচনা প্রার্থনীয়।

প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক রোমা রোঁলা মহেন্দ্রনাথের গ্রন্থের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন।

উর্ম্মিল পয়োধির উচ্ছ্বাস তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিল; সম্রাটের বৈভব বর্ণনা ক্ষুধিতের উদর জ্বালা নিবৃত্ত করিতে পারিল না দেখিয়া পরে গ্রন্থকার সরস পক্কান্নের ব্যবস্থা করিলেন। "শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান", "ব্রজধাম দর্শন", "বদরিনারায়ণের পথে" ও "নিত্য লীলা" নামক কতিপয় গ্রন্থ রচিত হইল। সহজ সরল মাতৃভাষায় বর্ণিত হৃদয়গ্রাহী ভাবের প্রাচুর্য্য গ্রন্থগুলিতে দৃষ্ট হয়। গ্রন্থকারের প্রাণের বাণীগুলি তৃষিত প্রাণে তৃপ্তি আনয়ন করিল। ক্ষুৎ পিপাসা নিবৃত্ত হইল, ভক্ত প্রাণে শান্তি আসিল, আপন উপলব্ধি বলে শৈব ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের সারতত্ত্ব ঐ সকল গ্রন্থে অতি সুন্দর রূপে সহজ ভাবে অল্প কথায় তিনি বুঝাইয়াছেন। ভারতীয় ঈশজ্ঞান আর অপরাপর দেশের ঈশ্বরতত্ত্ব মধ্যে প্রভেদটী প্রদর্শন করিয়া সাধকের প্রাণ হইতে ধর্ম্মের বিভীষিকা ও সংকোচ বিদূরিত করিয়াছেন। 'বল্লভকে' হৃদয়ের অতি সন্নিকটে আনিয়া দিয়াছেন, 'দয়িতের' প্রাণে রস সঞ্চারিত করিয়া কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। ব্রজমণ্ডলের ভাব সহজ লভ্য করিয়া রসমধু বিতরণে ধন্য হইয়াছেন। ব্রজধামে বাস তাঁহার সার্থক হইয়াছে।

বিকশিত কুসুমের প্রেম-মধুর সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া বহু দর্শনার্থীর সমাগম হইল; ভক্ত মণ্ডলীর জন্য মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থাও হইল, কতিপয় রসময় সিদ্ধ পুরুষের

জীবন নৈবেদ্য রচনা করিলেন। মহেন্দ্রনাথ লিখিত "সাধু চতুষ্টয়" গ্রন্থ এবং শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ, সারদানন্দ, নিশ্চয়ানন্দ ও মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তাঁহার সশ্রদ্ধ রচনাগুলি ভক্তিমান্ পূজকের স্তব পাঠের ন্যায় শ্রোতার হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব জাগাইয়া তুলিল। শুধু তাহাই নহে, গুণগ্রহণ-যোগ্যতাও শিক্ষা দিল। এই মহাপুরুষগণ সম্বন্ধে সাধারণ দৃষ্টির বহির্ভূত কত যে নূতন তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় তাহা পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। "লণ্ডনে বিবেকানন্দ" নামক গ্রন্থে বিশ্ববিজয়ীর প্রবাস জীবনের অন্তরালে দৈনন্দিন চিত্রখানি কথঞ্চিৎ উন্মোচিত হইয়াছে। ইহা পাঠে অগ্রজের প্রতি লক্ষণের ন্যায় অনুজের প্রগাঢ় অনুরাগ বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাও শ্রদ্ধাবান্ পুরোহিতের অর্চ্চনার দ্বারা যজমানের হৃদয়ে ভক্তি সঞ্চারিত করিল। এই জীবন্ত দৃষ্টান্তগুলি দ্বারা মহেন্দ্রনাথ তৃষিত প্রাণে আশার শুভ বার্ত্তা আনিয়া দিয়াছেন।

মহেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক নূতন ছন্দে দুইখানি কাব্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও দুইখানি লিখিয়াছেন। এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশে আপন পর্য্যটক জীবনের অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ—Federated Asia, National Wealth, Status of Toilers, Homocentric Civilisation নামে চারিখানি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন। সমুদয় গ্রন্থই তাঁহার

ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক, স্থাপত্য, দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক বিদ্যার প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে। জীবনব্যাপী অধ্যয়ন, ভ্রমণ ও পর্য্যবেক্ষণ এবং ধর্ম্ম সাধনার ফল এইভাবে জগতে প্রসাদরূপে বিতরণ করিয়া এক্ষণে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া শান্তিময় চিত্তে পরমপদ লাভের অপেক্ষা করিতেছেন। এখন শিশুর ন্যায় লঘু অল্পাহারী এবং দুগ্ধ পায়ী; মৃদু ও স্বল্প ভাষী; চুরাশী বৎসরের বৃদ্ধ শরীর জরাজীর্ণ, অপটু অচলপ্রায়; দর্শন ও শ্রবণ শক্তি ক্ষীণ; বুদ্ধি ও স্মৃতি অবিকৃত; আভা অম্লান—সমুজ্জ্বল; প্রেম সর্ব্ব প্রসারিত; অন্তর আনন্দময় ও অভী—পরকে অভয় দান মাত্র কার্য্য। অন্য কোলাহল নীরব, শান্ত! শান্তিময় পরিবেশ—সেবকগণও তথা।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে স্থানে মহিম বাবু বা মহেন্দ্রনাথের সহিত প্রথম মিলিত হই, সেখানেই আজ তাঁহার শুক্ল মঞ্জরিটী দর্শন করিবার সৌভাগ্য ঘটিল। অতীতের পুণ্য-স্মৃতি মনে জাগিল। তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার জন্মদিনে আজ তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে উপহার দিলাম। মহেন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনযাত্রাপথ সুদীর্ঘ হউক এই প্রার্থনা! স্বর্গীয় আনন্দে সকলের মন, প্রাণ, নয়ন পূর্ণ হউক!

পূর্ণ হউক!! পূর্ণ হউক!!!

ওঁ তৎ সৎ, ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

## প্রণাম

উন্নত তনু আজিও উন্নত,
উন্নত বক্ষ শির,—
প্রেমভরা হৃদে ডাকিছ সবায়,
উন্নত রাজ্যে বীর ?
অরব দেশের বাণী মুখরিত—
গ্রন্থে করি' প্রচার।
নরেন্দ্রানুজ-মহেন্দ্র,—চির সঙ্গি ?
করি হে, নমস্কার।

সমাপ্ত

# শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত গ্রন্থাবলী

—:*:—

1. Federated Asia.
2. Mind.
3. Metaphysics.
4. National Wealth.
5. Natural Religion.
6. Energy.
7. Principles of Architecture.
8. Lectures on Status of Toilers.
9. Homocentric Civilization.
10. Reflections on Woman.
11. Status of Women (Beng. Translation).
12. Lectures on Education.
13. Dissertation on Painting.
14. Appreciation of Michael Dutt and Dinabandhu.
15. Kurukshetra

১। কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ
২। ব্রজধাম দর্শন
৩। নিত্য ও লীলা
৪। পাশুপত অস্ত্র লাভ
৫। মায়াবতীর পথে
৬। ঊষা ও অনিরুদ্ধ
৭। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান
৮। বদরীনারায়ণের পথে
৯। সাধু চতুষ্টয়
১০। গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প
১১। বৃহন্নলা
১২। খেলাধূলা ও পল্লী-সংস্কার
১৩। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ ( ১ম ও ২য় খণ্ড )
১৪। শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুধ্যান
১৫। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান
১৬। শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী।
১৭। শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান

## ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত পুস্তকাবলী

Dialectics of Land—
Economics of India
Dialectics of Hindu Ritualism
Mystic Tales of Lama Taranatha
Vivekananda the Socialist
Studies in Indian Social Polity
ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)
ভারতীয় একজাতীয়তা গঠন সমস্যা
বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব
ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম
অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস
সাহিত্যে প্রগতি
সমাজতন্ত্রবাদ ( এঙ্গেলসের অনুবাদ )

……ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শধন্য ভক্তমণ্ডলীর প্রায় সকলেই আজ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। যে ৮৪ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ আজিও সেই স্মৃতি বক্ষে লইয়া একান্ত নিষ্ঠার সহিত জীবনতরীখানি বাহিয়া চলিয়াছেন তাঁহার নাম শুনিয়া থাকিলেও তাঁহার জীবন সম্পর্কে আজিকার পাঠক সমাজ অনেক কিছুই জানেন না।

বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রাণেশকুমার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র দত্তের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের একটি সংক্ষিপ্ত তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

হিমাদ্রি—পৌষ, ১৩৬০

······গ্রন্থকার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র-নাথের একটি অনবদ্য চরিত্র চিত্রাঙ্কণ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনার শৈলী অতি অনুপম—সহজ, সরল, সাবলীল এবং প্রসাদ গুণসম্পন্ন। মহেন্দ্রনাথের পরিচয় স্বামী ব্রহ্মানন্দের বাক্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে—"মহিন্ আমার সাদা কাপড়ে সন্ন্যাসীরও বাড়া"—উদার, উদাসীন, গম্ভীর, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়—ইহাই মহেন্দ্রনাথের সঠিক চিত্র ও জীবনের সুর—ব্যবহারিক জগতে শিশু, জ্ঞানে ও ইন্দ্রিয় সংযমে ঋষি।······ইংলণ্ড, ইউরোপ, এসিয়া এবং আফ্রিকায় ভ্রমণকালে তাঁহাকে যে বিচিত্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয় তাঁহার বর্ণনাতে তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা, স্থৈর্য্য, ও নির্ভীকতা চিত্রিত দেখিতে পাই।······শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র সংস্পর্শ গুণে তাঁহার ধর্ম্মভাব পরিপুষ্ট হয়। বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে অবস্থান কালে তাঁহার রাধাভাব হইয়াছিল।······গ্রন্থকার সাধু কিষণজীর অপূর্ব্ব প্রেম, সেবা, বিনয়, নিরাসক্তির মনোজ্ঞ চিত্র আঁকিয়াছেন। নাহু মহারাজ প্রমুখ সাধুদের সেবাব্রত ও মায়াবতী, কনখল, এবং অন্যান্য আশ্রমের কাহিনী পড়িতে ভাল লাগিল।

প্রিন্সিপাল শ্রীকালিপদ মিত্র (হুগলী)